মিশ্রির মেয়ে

(আন্তর্জাতিক উপন্যাস)

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম. এ.
বিরচিত

কলিকাতা

মাঘ, ১৩৪৭।

মূল্য—১।০

প্রকাশক : শ্রীমুরহরি ভট্টাচার্য্য
৪৪।সি বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিস্ত্রির মেয়ে

(১)

কালি মিস্ত্রির মেয়ে নয়নতারার বয়স সতেরো আঠারো হবে, কিন্তু তার এখনও বিয়ে হয় নি।

মিস্ত্রি অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সকলেই চায় পণ। সেদিকে যে মিস্ত্রির থলি একেবারেই বাড়ন্ত, একথাটা কেউ বুঝে দেখলে না। কাজেই বিয়ের বাজারে কোথাও সে কল্কে পেলে না।

পরিবার হেমা কতো বাগ্‌গতা কর্ত্তে লাগলো, কিন্তু কালি কি করবে? যদি পাটকলের তাঁতে কোনও জামাই তৈরি হতে পারতো, তাহ'লে না হয় সে একবার চেষ্টা দেখতো। কিন্তু তাতো হবার নয়।

একটু ছুটি পেলেই সে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতো কিন্তু সেইটুকুই তার সার হ'ল। প্রজাপতি দেবতা কিছুতেই ধরা দিলেন না।

পাটকলের মিস্ত্রির মেয়ে হ'লে কি হয়, এদিকে নয়নতারা দিন দিন বেড়েই যেতে লাগলো। বাপ সামান্য মাইনে পায় এ অজুহাতটা তার দেহ কিছুতেই মানতে চাইলো না।

টাকা হয়তো কিছু যোগাড় হ'তে পারতো। কিন্তু কালি নিজেই সেদিকে ছিল মস্ত অন্তরায়। হপ্তার দিন মাইনে পেলেই সে আগে গিয়ে ঢুকতো তাড়ির দোকানে। ছ'টা দিনের পরিশ্রম সে একদিনে জল

ক'রে আসতো বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে। তা না হ'লে তার শরীরটা নাকি বড়ই মাটি মাটি করতো।

আগে ছিল রোজগার বেশী। তখন চটকলেরও অবস্থা ভাল ছিল, সাহেবরা মাইনেও দিত মোটা রকমের। তখন থেকে তার এই অভ্যাসটা হয়। আজকাল চটকলের অবস্থা খারাপ, কাজেই কালি-চরণের মাইনে ও রোজগার দুই-ই কমে গিয়েছে। আয় কমে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসটা কমলো না।

এই সব কারণে ও অকারণে কালি মিস্ত্রির হাতে আজকাল টাকা আটকায় না। মেয়ের বিয়েও মুলতুবি পড়ে গিয়েছে।

*　　*　　*　　*

তারা যে ঘরে থাকতো, তার পাশের ঘরেই থাকতো লছমন। এটা চটকলের মজুরদের থাকবার একটা লাইন। লাইনে অনেক কামরা আছে। এক একটা কামরায় মজুর মিস্ত্রিদের এক একটা গেরস্থ থাকতো। এমনি একটা কামরায় কালিচরণ বাসা পেয়েছিল। এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকতে গেলে ভাড়া বেশী লাগে। কালিচরণের সে ক্ষমতা ছিল না। কাজেই এই লাইনেই সে এক রকম করে মাথা গুঁজে কাটিয়ে দিত।

লছমন হিন্দুস্থানী মজুর; কিন্তু বড় ভাল ছেলে। কালিচরণ পাট কলের যে ঘরে কাজ করতো, লছমনও সেই ঘরের একজন মজুর। কাজেই কালিচরণের একটু বাধ্য ছিল।

কিন্তু কালির বউ হেমা ছোঁড়াটাকে একেবারেই দেখতে পারতো না। তার প্রধান কারণ ছিল, সে মেড়ো—আর তারা বাঙ্গালী।

মেড়োর সঙ্গে তার স্বামীর এতটা মাখামাখি সে একটু ঘৃণাব চক্ষে দেখতো। কিন্তু কালির মনে অতোটা বৈষম্য ছিল না।

হেমা পছন্দ না করলেও, লছমন যেচে যেচে এসে কালির সঙ্গে মেলা-মিশি করতো। টাকাকড়ির দরকার হ'লেও কিছু কিছু ধার দিত।

নয়নতারা সুমুখেই ঘুরে বেড়াতো তার নবীন-যৌবনে-ভরা দেহখানি নিয়ে।

লছমনের চোখ তা না দেখে থাকে কি ক'বে? কিন্তু চোখ যা করে করুক, মনটা কুঁকড়ে থাকতো হেমার ভয়ে। কালি মিস্ত্রির বউ যদি জানতে পারে, তাহ'লে যে তাকে অনেক বাক্যবাণ সহ্য করতে হবে, এটা সে বেশ ভালই জানতো।

নয়নতারাও বুঝতো, লছমন তার দিকে আড়চোখে চোখে তাকায়। কিন্তু সে যে মেড়ো, তাকে কি ফিরিয়ে দৃষ্টিদান করা যায়?

হেমাঙ্গিনী পাকা গিন্নি। বুঝতো সব, অথচ বুঝতোও না কিছু। যতোটা পারতো নয়নতাবাকে আড়াল ক'রে রাখতো ঐ মেড়ো ছোড়াটার কেমন-কেমন চাহনিব সুমুখ থেকে। তবু মাঝে মাঝে বল্লা আল্লা ক'রে দিত এই ভেবে, যে মেড়োতে বাঙ্গালীতে ত কখনও অঘটন ঘটন হবে না, তবে এতো সাবধান কিসের জন্যে?

হেমাব সঙ্গে নয়নতারাকেও সব গৃহস্থালীর কাজ করতে হয়। লাইনের প্রত্যেক কামরায় ত আলাদা আলাদা জলের কল নেই; জলের দরকার হ'লে যেতে হোতো সেই বাহিরের উঠানে, যেখানে একটা মাত্র-জলের কল ছিল সমস্ত মজুব মিস্ত্রিদের জল সরবরাহ কর্ব্বার জন্যে। কাজেই

মিস্ত্রির মেয়ে

নয়নতারাকে প্রায়ই কলসী কাঁখে বাহির হ'তে হোতো সেই উঠানের দিকে। সেখানে জলের কলের চারি ধারে, হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী মাদ্রাজী সকল জাতিরই মেয়েদের বৈঠক বসতো নানা রকম কথাবার্ত্তা, সুখদুঃখ, মনের কথা, মনের ব্যথার আদান প্রদান নিয়ে।

—আরে নয়নাদিদি? সাদির কুছ ঠিক হোলো? একদিন এক হিন্দুস্থানী বউ জিজ্ঞাসা করলো।

নয়নতারা এ প্রশ্নে উপহাসের দুর্গন্ধ শুঁকতে পেলো। কাজেই সে একটু চটে গিয়ে বললে: আমার কেন সাদি হতে যাবে, তোর হোক্।

—আরে, হামার তো হো গিয়া। হাম তো মজা লুঠতা হ্যায় তোম্ কব্ লুঠেগা ভাই?

নয়নতারা ঠোঁট উল্‌টে হিন্দুস্থানি বউটার দিকে ঘৃণা প্রকাশ করলে। নয়ন ভাবলে, এইখানে কথাটার শেষ হবে। কিন্তু তা হলো না। হিন্দুস্থানী বউ অত শীঘ্র দমে না।

—আরে দিদি? গোসা হও কাহে?

নয়নতারা এবার একটু নরম হ'ল। কলসীটা কলের মুখে রেখে বললে: গোসা হবো কেন?

—আজ তোমারা মেজাজ আচ্ছি নেহি। মায়ি কো সাথ্ কুছ ঝগড়া হুয়া?

—ঝগড়া আবার কিসের? তোদের যেমন, কথায় কথায় ঝগড়া, আমাদের অমন হয় না। বাবার বড় অসুখ, তাই মনটা ভাল নয়।

—কিয়া অসুখ ? মেড়ো-বৌ জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ দুদিন জ্বর, মোটে উঠতে পাচ্ছেন না। কাজে বেরুতে পাচ্ছেন না, সমস্ত দিন শুয়ে আছেন। ডাক্তারকে খবর দেবে, এমন একটা লোক বাড়ীতে নেই।

—আচ্ছা, হামারা আদমিকো ভেজ দেগা ; ও ডাগ্‌দারকো বোলায় দেগা।

মেড়োর বউ-এর তখন জল নেওয়া হয়ে গেছে। সে এই আশ্বাসবাণী দিয়ে, মণ-খানেক রূপোর মল পায়ে নাড়তে নাড়তে চলে গেল। নয়নতারাও জল নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

(২)

কিন্তু মেড়োর বউ তার অন্দরে এসে সব কথা ভুলে গেল। প্রথমতঃ তখন তার আদমি বাড়ীতে ছিল না, দ্বিতীয়তঃ সে একটা কথার কথা বলে এসেছিল মাত্র, কথার দাম তত বুঝতো না।

সে ভুললো ; কিন্তু কালিচরণের ভাগ্য-বিধাতা আর একদিক দিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

লছমন তখন এসেছিল বাসায় তার মধ্যাহ্ন আহার সারতে। তার বাড়ীতে কেউই ছিল না, সে একাই থাকতো। ভাত খেতে এসে, খোলা দরজার ভিতর দিয়ে তার নজর পড়লো, নয়নতারা বাহিরে কলতলায় জল নিতে এসেছে। আহা ! বেশ গড়নটি ! কলসীটি কাঁখে নিয়ে তাকে

দেখতে হয়েছিল তাদের হিন্দুস্থানী ভাগবতে পড়া বৃন্দাবনের গোপিনীর মতো। আহা! কি ঠমকে ঠমকেই চলচে নয়না!

ভাত বেড়ে নিয়েও লছমনের চোখ ফিরলো না নয়নতারার রূপ মাধুরী থেকে। মনের চোখ যখন খোলে, তখন বাইরের চোখও বন্দ হতে চায় না।

কাণও উঠলো সজাগ হয়ে। নয়নতারা কি বলচে, লছমন ভাত খেতে খেতে তাই শুনতে লাগলো।

সে শুনলো নয়নতারার বাপের বড় অসুখ, তাই তার মনটা বড় খারাপ। কালি মিস্ত্রির অসুখ! তা হবে,—তাই মিস্ত্রি দুদিন কাজে যায় নি। তার তো উচিত ছিল, কালি মিস্ত্রির খবর নেওয়া। কাজটা ভাল হয় নি।

আচ্ছা, ওরাও তো খবর দেয় নি! বোধ হয় মিস্ত্রির বউ মনে করে, লছমন মেড়োর ছেলে, সে অসুখের সময় কি উপকার কর্ব্বে?

লছমনের মনটা একটু খারাপ হলো এই অবহেলায়। কিন্তু সে এটা গায়ে না মেখে, আহারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে, গেল মিস্ত্রির বাড়ীতে।

কই রে কাজল? তোর বাবা কোথা?

কাজল নয়নতারার ছোট বোন্। সে বোধ হয় ঘুমুচ্ছিল, কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু তার বদলে আর একজন উত্তর দিল। সে নয়নতারা।

নয়নতারা লছমনের কাণে সুধা বর্ষণ ক'রে বললেঃ বাবার বড় অসুখ।

—অসুখ ? কই হামারে জানালে না ?

লছমন বাঙ্গালা দেশে এসে অনেক বাঙ্গালী মিস্ত্রি ও মজুরের সঙ্গে মিশে মিশে বেশ বাঙলা কইতে পারতো। তবে তার ভাষায় হিন্দুস্থানী টান ছিলই।

—কই, বাবা কোথায় শুয়ে আছেন ? দাওয়ার উপর উঠে এসে লছমন জিজ্ঞাসা করলে।

হেমাঙ্গিনী লছমনের সঙ্গে কথা কইতো না, কতকটা ঘৃণায়, কতকটা অনাবশ্যকে। লছমনকে দেখে, সম্ভ্রমে সে একটু গায়ের কাপড়-চোপড়গুলো টেনে দিল।

—মিস্ত্রি ? কি হয়েসে ? জ্বর হয়েসে ?

মিস্ত্রি ছিল লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে। লেপের ভেতরেই মুখ রেখে সে উত্তর দিল ঃ উঃ! বড্ড জ্বর। বুকটাও বড্ড ব্যথা করচে।

—ডাগ্‌দার ডাকবো ?

—না, না, পয়সা কড়ি নেই। তুমি মুখে বলে একটু ওষুধ এনে দাও।

—আরে কি বলসো মিস্ত্রি ? এত্‌না জ্বর, মুখমে বোলে কি ওষুধ লাগবে ? তার ওপর বলসো বুকে ব্যথা। ও ডাগ্‌দার ডাক্‌নেই হোগা।

লেপের ভেতর মাথা নেড়ে মিস্ত্রি কোঁতাতে কোঁতাতে বললে ঃ ডাক্তার এলেই তো এখনি দু'টাকা ফিস্‌ বার কর্ত্তে হবে !

লছমন বললে ঃ আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। হামি সে বুঝবো।

নয়নতারার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে লছমন বেরুলো ডাক্তারের চেষ্টায়।

(৩)

চটকলের ডাক্তার একজন বাঁধা আছেন।

তাঁর নাম হরেন বাবু। ডিস্‌পেনসারিও আছে চটকলের সীমানার মধ্যে একটা আলাদা বাহিরের কামরায়। সেখানে তিনি দুপুরবেলায় উপস্থিত থেকে কলে আহত রোগীদের চিকিৎসা কত্তেন। মজুর মিস্ত্রিদেরও জ্বর-জাড়িতে ঔষধের ব্যবস্থা কত্তেন, রোগী ডিস্‌পেনসারিতে এলে। রুগীদের কামরায় গিয়েও দেখবার নিয়ম ছিল, কিন্তু সে নিয়মটা খাটতো বাড়াবাড়ি রোগ হ'লে। সামান্য অসুখে মজুর মিস্ত্রীদিগকে ডিস্‌পেনসারিতে নিয়ে আসতে হোতো।

লছমন ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে একটা সেলাম করে দাঁড়াল। তখন ঘরে রুগী কেউ ছিল না; ডাক্তার বাবু টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেটে টান মারছিলেন; ও একখানা খবরের কাগজ চিবিয়ে তা থেকে রস বার কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছিলেন। লছমনকে আসতে দেখে তিনি নাকের চশমাখানা কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: কিয়া হুয়া?

বাবু? কালিচরণ মিস্ত্রিকো বড় ভারি বেমার। আপকো একদফা যানে হোগা।

অবজ্ঞাভরে ডাক্তার বাবু বললেন: আরে, যানেকো কিয়া জরুরৎ হ্যায়? তোম্ উসকো হিঁয়া লিয়া আও না।

পকেটে দুটো টাকার শব্দ ক'রে লছমন বললে: ও আনে নেহি শকেগা। আপ কো হুঁয়া যানেই হোগা।

টাকার শব্দে ডাক্তার বাবুর মনটা উল্টো দিকে বইলো। তিনি বুঝে নিলেন, এখানে দেখতে যাবার নিয়ম না থাকলেও, অন্য কারণে নিয়ম সাব্যস্ত হচ্চে। তিনি টেবিল হতে পা নামিয়ে বললেন আচ্ছা, চল্ দেখে আসি তোর রুগী!

(৪)

লছমন ডাক্তার ডাকতে গেল দেখে, কালিচরণের বউ হেমাঙ্গিনীও একটু চঞ্চল হ'ল। লছমন ডাক্তার বাবুর ফি দেবে, এটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে গেল বটে, কিন্তু সেটা হেমাঙ্গিনীর কাছে ভাল লাগলো না। ঐ নীচু-জাত লছমনের কাছে সে নত হতে যাবে কেন?

সে বাঙ্গালী; তার ওপর মিস্ত্রির বউ। সে মেড়ো মজুরটার কাছে সাহায্য নেবে কেন?

কিন্তু মনে পড়লো তার, ঘরে এখন একটি পয়সাও নাই। মিস্ত্রি যে ক'টা টাকা হপ্তায় পেয়েছিল, শনিবার রাত্রে সব ক'টাইতো ফুঁকে দিয়ে এসেছে। সংসার চলেচে ধারের উপর।

তবু একবার পেঁটরাটা খুলে সে দেখলে। কাপড় চোপড়ের নীচে যদি একটা আধটা টাকাও পড়ে থাকে, তাহ'লে লছমনের কাছে এই অপমানটা তাকে স্বীকার কর্ত্তে হয় না। কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী এমনই

বিরূপ, যে টাকা ছেড়ে একটি আনিও কোথায় লুকিয়ে নেই। মনে মনে কপালটার উপর সে ভারি চটে গেল : পরে নয়নতারাকে ডেকে সে বললে দেখ্‌না নয়না, যদি কারুর কাছে দুটো টাকা ধার পাস্‌।

—টাকা কি হবে মা ? নয়ন জিজ্ঞাসা কল্লে।

—ডাক্তারকে ফি দিতে হবে না ? সে কি অমনি দেখে যাবে ?

—কেন, ঐতো লছমন বললে, সে সেসব বুঝবে 'খন।

মুখ বেঁকিয়ে মা বললে : ছ্যা ! একটা মেড়োর কাছে এমনি নীচু হতে হবে !

মেয়ে ম'ার মর্ম্ম-ব্যথা বুঝলে ; কিন্তু চুপ করে রইলো। বাপ ওদিকে 'জল, জল' ক'রে কাতরোক্তি কচ্ছিল, কাজেই নয়ন একটা গ্লাসে জল নিয়ে বাপকে দিতে গিয়ে বললে : কোথায় এখন যাবো টাকা ধার কর্ত্তে ?

মা বললে : কেন, ঐ ঘোষেদের কাছে একবার দেখ্‌ না।

মেয়ে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বললে : আমি পার্ব্বো না, ঘোষ দিদির কাছে টাকা চাইতে। সেদিন আমায় কলতলায় কি কথাটা না শোনালে। পাঁচটা টাকা বুঝি তোমার কাছে পাবে, তাই নিয়ে আমাকে চোখের জল ফেলালে।

তবে না হয় বুদ্ধুর বউয়ের কাছে ?

সেওতো মেড়ো ! তার কাছে নীচু হ'তে হবে না ?

তা হই হবো তার কাছে নীচু। তা ব'লে লছমনের কাছে আমার ভাল লাগে না। দেখিস্‌ না, ছোঁড়া তোর দিকে কেমন প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে চায় !

মায়ের কথা শুনে মেয়ের মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো। সে আর কিছু বললে না।

মা বলে যেতে লাগলো: লছমনটা একটা পাটের কলের কুলি। ওকি একটা মানুষ! ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার মেয়ের মুখের দিকে চায়! অন্য লোক হ'লে, ওকে মেরে, হাড় গুঁড়িয়ে,—

ঠিক এমনি সময় লছমন ডাক্তার নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। হেমাঙ্গিনীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। সে আর বাকিটুকু বলবার সময় পেলে না।

ডাক্তার বাবু ঘরের মধ্যে এসে বললেন: কৈ কি হয়েছে মিস্ত্রি? দেখি।

মিস্ত্রি ছিল আপাদ মস্তক কাঁথায় মুড়ি দিয়ে। ডাক্তার বাবুর গলা শুনতে পেয়ে সে কাঁথাটা মুখ থেকে নামিয়ে কোঁতাতে কোঁতাতে বললে: উঃ! ডাক্তার বাবু! বড্ড বুকে বেদনা।

লছমন মাঝে থেকে বললে: দেখুন তো বাবু! মোনিয়া টোনিয়া হ'ল কি না?

ডাক্তার বাবু অবহেলার স্বরে বললেন: হ্যাঁ! মোনিয়া! নিউমোনিয়া অমনি হলেই হ'ল আর কি! আচ্ছা, দেখি মিস্ত্রি!

মিস্ত্রির বুকে একটা ময়লা গেঞ্জি ছিল। সে সেটা খুলে ডাক্তার বাবুর সম্মুখে বুক খুলে ধরলো।

ডাক্তার বাবু বুকপকেট থেকে তাঁর চোঙাটা বার করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন।

পরীক্ষার সময়, লছমন একবার সগর্ব্বে নয়নতারার মুখের দিকে

তাকালো। উদ্দেশ্য তার এই উপকারে নয়নতারার মনটা কতটা প্রসন্ন হয়েছে, তার প্রতিবিম্বটা মুখের আয়নায় দেখা। নয়নতারা কিন্তু ঠোঁটটা একটু উল্‌টে, মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা শেষ হলে ডাক্তার বাবু বললেন ঃ তাইতো লছমন ! সর্দ্দিটা যে খুবই বসেছে। নিউমোনিয়াই বটে ! তা চল্‌ ডিস্‌পেনসারিতে একশিশি ওষুধ আর একটা মলমের কৌটো পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার বাবু লছমনের দিকে হাত পাতলেন।

লছমন পকেট থেকে তুটো টাকা বের করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন ঃ তু' টাকা কিরে ? চারটে টাকা দে !

লছমন বললে ঃ বড় গরীব লোক বাবু !

···াছেই হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়েছিল। তার মুখখানা বৈশাখ মাসের মেঘের মত কালো হয়ে উঠলো।

(৩)

নয়নতারা কলতলায় জল ভরছিল।

তখন বেলা চারটে হবে। লাইনের সকল পুরুষমানুষ ও মজুর্নী কাজে বেরিয়ে গেছে। এ সময়ে কলতলায় তুচার জন বউ ছাড়া আর বড় বেশী কেউ আসে না।

সূর্য্যটা ছিল ঠিক পেছনে। নয়নতারা সম্মুখ দিকে আপনার ছায়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিল।

আর একটা ছায়া পাশে পড়তেই নয়নতারা চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে, লছমন দাঁড়িয়ে। নয়ন বিস্মিত হ'ল, এ সময় লছমন কেমন করে কাজ ছেড়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

নয়ন ফিরে দেখতেই লছমন জিজ্ঞাসা করলে ঃ নয়ন! মিস্ত্রি এখন কেমন আছে ?

নয়ন গায়ের কাপড়খানা একটু আঁটো-সাঁটো ক'রে টেনে জল ভরতেই লাগলো, কিছু উত্তর দিল না।

লছমন উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ হাঁ, নয়না! মিস্ত্রি কেমন আছে ?

কলসীটা ভরে গিয়েছে, কাজেই নয়ন সেটাকে কাঁখে তুলে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। লছমন আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ কি? কথা জবাব দিচ্চ না যে ?

নয়ন আর এক পা ফেলে বললে ঃ ঐতো ঘরে বাবা রয়েছে, গিয়ে দেখে এসো না।

—সে তো যাবই। তবু তোমার কাছে একবার জিজ্ঞাসা কচ্চি।

নয়ন দাঁড়িয়ে বললে ঃ কলতলায় একা একা তুমি আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না। কে কোথায় দেখতে পাবে, আর আমার মাথা খাবে।

লছমন একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে বললে ঃ কই, কেউ এখেনে কোথায়ও নেই! একটা আধটা কথা কইতে দোষ কি ?

প্রথমটা নয়ন কিছু উত্তর করলে না। সে চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু আবার কি ভেবে দাঁড়িয়ে বললে : দোষ আছে। সে তুমি বুঝবে না। ব'লে সে দ্রুতগতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

(৬)

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে লছমন নয়নতারাদের বাড়ী গেল মিস্ত্রির খবর নিতে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে হেমাঙ্গিনী বসে মিস্ত্রির পরিচর্য্যা কচ্চে, এবং মিস্ত্রি রোগে বড় ছটফট কচ্চে। নয়নতারা সেখানে নাই, রান্নাঘরে গিয়ে সংসারের রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। তার হাতা নাড়ার শব্দ এ ঘর থেকেও লছমন বেশ বুঝতে পারলে।

লছমন জিজ্ঞাসা করলে : আজ মিস্ত্রি কেমন আছে ?

হেমাঙ্গিনী আজ আর তার সঙ্গে কথা না কয়ে থাকতে পারলে না। আজ আর গায়ের কাপড়খানা শুদ্ধ টেনে দিতে সে ভুলে গেল। বললে : আজ রোগ বড় বাড়াবাড়ি। জ্বরও যেমনি বেড়েছে, হাঁপও তেমনি হচ্চে। আজ এখন একবার ডাক্তার এনে দেখাতে পারলে ভাল হয়।

লছমন শুনে বললে : বেশ তো। হামি এখনই যাচ্ছি ; ডাগ্দার ডেকে আনচি।

সে আর নয়নতারাকে দেখবার জন্যে বিলম্ব করলে না। ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে পড়লো।

ডাক্তার বাবু এসে পরীক্ষা করে বললেন : আজ রোগের বড় বাড়াবাড়ি। রাত্রিটায় খুব সাবধান। সমস্ত রাত্রি জেগে তোমরা ওষুধ খাওয়াও।

তিনি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন। আজও লছমন তার নিজের পকেট থেকে ডাক্তার বাবুর দর্শনী দিল, হেমাঙ্গিনীর সামনে।

ওষুধপত্র এনে লছমন হেমাঙ্গিনীকে খাওয়াবার নিয়ম বলে দিল। হেমাঙ্গিনী সব শুনে বললে : কিন্তু আজ আমার বড় ভয় কচ্চে। বাড়ীতে একটি পুরুষ মানুষ নেই। আমরা মাত্র তুটি মায়ে ঝিয়ে। রাত্রে যদি বাড়াবাড়ি হয়, ত কি করে কি হবে, বুঝতে পাচ্চি নে।

নয়ন তখন ঘরের মধ্যে ছিল। তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার মুখের দিকে তাকাবামাত্র লছমনের মনটা দয়ায় সিক্ত হয়ে উঠলো। সে একদণ্ডে সঙ্কল্প স্থির করে বলল : আচ্ছা, হামি আজ রাত্রে তোমাদের এখেনে থাকবো। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রাত্রে ডাগ্‌দার ডাকবার দরকার হয়তো, ওবি করবো।

নয়নতারার যে তাতে খুব মত ছিল, তা নয়; তবু তার মুখখানা আগেকার চেয়ে প্রফুল্ল হলো।

হেমাঙ্গিনীও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লছমনের অযাচিত পরোপ-কারিতার তারিফ করলে।

লছমন তাড়াতাড়ি বাসা থেকে ভাত খেয়ে এল; তারপরে বসলো রোগীর পাশে, গায়ে একটা গেঞ্জি চড়িয়ে।

রোগীর শিয়রে বসে রইলো হেমাঙ্গিনী, হাতে একখানা পাখা নিয়ে।

মিস্ত্রির মেয়ে

নয়ন গেরস্থালীর এটা ওটা সেটা সেরে মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। তার চুলগুলো সেদিন বাঁধা হয় নি, সেগুলো অযত্নরক্ষিত অর্থের মত আপন আপন দিকে আপনাদের ব্যবস্থা করে নিল।

লছমন মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে নিতে লাগলো, তার অসাবধান দেহকান্তি। সমস্ত দিন সংসারের কাজে গতর খাটিয়ে এখন নয়ন একেবারেই অবশ হয়ে পড়েছিল। কাজেই গায়ের কাপড় যে ঠিক তার সমস্ত অঙ্গকে বিশ্বস্ত ভাবে প্রহরা দিচ্ছিল, তা নয়। নিদ্রার সিঁদকাটিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেক স্থানই চোরের চোখে লোভ জাগিয়ে তুলছিল, যদিও সে নিজে তার কোনও খবরই রাখতে পারছিল না।

লছমন একবার তাকায় রুগীর দিকে, আর তিন বার তাকায় নিদ্রাতুর নয়নের যৌবনোৎফুল্ল সুপুষ্ট দেহলতার উপর। রুগীকে একবার ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে, নানা অছিলায় পাঁচবার তাকিয়ে নেয়, ঐ বহুকাল-সাঞ্চত পিপাসার সুধাভাণ্ডের দিকে। সে আজকের রাত্রি-জাগরণটা বড়ই সৌভাগ্যের বলে মনে করে নিল, নিদ্রাহীনের কষ্ট তার মোটেই মনে এলো না।

হেমাঙ্গিনী তার স্ত্রী-বুদ্ধিতে এ সকল একটু একটু বুঝতে পারছিল, কিন্তু ব্যবস্থা তার কিছুই করলো না। আজ কি তার এসব দেখবার সময় আছে? তার স্বামী যে আজ জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে যমদূতের পাওনাগণ্ডার হিসাব নিকাশ করবে, না মদন দেবের ছিঁচকে চুরির ঠেকান দেবে?

*   *   *

মাঝ রাত্রে এক সময় মিস্ত্রির চোখ দুটো হঠাৎ কপালে উঠলো, এবং তার মুখ দিয়েও খানিকটা ফেণা মৃত্যু-দেবতার আগমনের আলপনার মত আত্মপ্রকাশ করলো। হেমাঙ্গিনী তাই দেখে একেবারে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

সে কান্নায় নয়নতারার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বাপের বিছানার কাছে গিয়ে দেখলে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকট। এ ধাক্কাটা সে সামলাতে না পেরে, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়লো মেঝের উপর। তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল, গোঁ গোঁ করতে লাগলো আকস্মিক অচেতনায়।

লছমন পড়লো বড় বিপত্তিতে। একদিকে মিস্ত্রির এই মুমূর্ষু রোগ-বিকার অন্য দিকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা নয়নতারার এই অতর্কিত মূর্চ্ছা।

কিন্তু কর্ত্তব্য সে শীঘ্রই স্থির করে ফেললে। যে মরেছে, তার আর পরিচর্য্যা করে লাভ নেই, কিন্তু যে বেঁচে আছে, তাকে তদ্বির করে খাড়া করাইতো দরকার। সে আর বিলম্ব না ক'রে, নয়নতারার পাশে বসে তার শুশ্রূষা করতে আরম্ভ করে দিল। তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে, খানিকটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে সে তার চোখ দুটো অনবরত সিক্ত করতে লাগলো, আর আলুলায়িত কেশ-রাশির উপরে শীতল জল সিঞ্চনে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ননীর মত সুকোমল কপোল থেকে জলধারা মুছিয়ে নেবার সময়—আঙুলগুলি খুবই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। এই নিদারুণ সময়েও তার মনে হতে লাগলো, কোন্ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আজ সে নয়নতারার গালে হাত দেবার অধিকার পেয়েছে। এমন মুহূর্ত্ত বুঝি আর তার জীবনে আসবে না। কত দিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা আজ তার পূর্ণ হ'ল ষোল কলায়।

সে যতো নয়নতারার মুখের দিকে তাকায়, তাকে নাম ধরে ডাকে, ততো বুকটা তার দুরু দুরু করে ওঠে কি এক অভাবনীয় ঐশ্বর্য্যসুখে। অজ্ঞান নয়নতারার কপোল থেকে এক এক গাছি করে চুল সে আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগলো, চোখে হাত দিয়ে চোখ খুলে আপনার মনের চোখ অনিমেষ ভাবে উন্মুক্ত করে দিতে লাগলো। ওদিকে হেমাঙ্গিনী তার স্বামীকে নিয়েই ব্যস্ত, এদিকে তার নজর একেবারেই ছিল না।

খানিকটা জলসেকের পর ও লছমনের ঐকান্তিক সেবাশুশ্রূষার ফলে নয়ন শীঘ্রই চোখ চাইলো। সম্মুখে লছমনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে: হাঁগা, বাবা বেঁচে আছেন তো?

—হাঁ, হাঁ, বেঁচে আছেন। ঐ যে তোমার মা ওষুধপত্র খাইয়ে দিলেন, এখনতো অনেকটা ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলচেন।

লছমনের কথা শুনে, নয়ন ধড়ফড়িয়ে উঠে, টল্‌তে টল্‌তে তার বাপের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লছমনের কোলে মাথা রেখে সে যে এতক্ষণ শুয়ে ছিল, এ লজ্জার কথাটা তার মনে একবারও ঠেলে উঠলো না। ওটা যেন কিছুই নয়, এমনি ভাবেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

লছমনও উঠে এসে মিস্ত্রির বিছানার পাশে দাঁড়াল। সে একবার নয়নের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: এখন অনেকটা সামলেছো তো?

নয়ন বললে, কেন, আমার কি হয়েছিল?

—আরে বাপ্‌রে! তুমি তো একেবারে গিয়েছিলে! তোমার মাথায়

দুঘটি জল ঢেলে তবে তো তোমাকে খাড়া করলুম। এসো, তোমার মাথাটা একটু গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেই।

বলে, লছমন হঠাৎ তার হাতখানা ধরলে। নয়ন তাতে বাধা দিয়ে বললেঃ যাও! তারপর নিজের হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে মায়ের আরও কাছে এসে দাঁড়াল। মা এখন ওসব বিষয়ে নিরপেক্ষ। তিনি স্বামীকে পাখাই করতে লাগলেন।

লছমন কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললোঃ এরপর তোমার যখন অসুখ করবে, তখন কে দেখবে?

নয়ন সংক্ষেপে বললেঃ যম দেখবে!

(৭)

মিস্ত্রির অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারবাবু সন্ধ্যাবেলায় যে তেজাল ওষুধটা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন হঠাৎ খারাপ অবস্থা হ'লে দেবার জন্যে, হেমাঙ্গিনী সেই ওষুধটা তখন দিয়ে দেয় তার উপস্থিত-বুদ্ধির জোরে, এবং তাইতেই মিস্ত্রি অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

লছমন যখন নয়নের তাঁদারক সেরে তাকে চাঙ্গা হয়ে উঠে আসতে দেখে, আপনিও এসে দাঁড়ালো মিস্ত্রির পাশে, তখন মিস্ত্রি সত্যসত্যই অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছে। তবু হেমাঙ্গিনী লছমনকে বললে, এতো যখন করলে বাবা, তখন আর একবার ডাক্তারবাবুকে

ডেকে আনো। নইলে আবার একবার ওভাব হ'লে আর মিস্ত্রিকে ফিরে পাওয়া যাবে না।

মিস্ত্রিকে ফিরে পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে লছমনের ততো চিন্তা ছিল না, যতো চিন্তা ছিল নয়নের সাগ্রহ আদেশের উপর। কাজেই সে নয়নের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: কি বলো নয়ন, ডাক্‌দারবাবুকে এ রাত্রে আর একবার ডেকে আনবো?

নয়ন পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বললে: তা আমি কি বলবো? মা যখন বলচে, তখন তার ওপর কি আবার কথা আছে?

লছমন বললে: তব্ যাই। দেখি, এত্‌না রাত্তিরে ডাগ্‌দারবাবু আসে কি না!

লছমন গেল, কিন্তু যেন নেহাত্ অনিচ্ছায়। হেমাঙ্গিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বললে: এও আমার কপালে ছিল!

* * *

লছমন অনিচ্ছায় ডাকতে গেলেও, ডাক্তারবাবু খুব ইচ্ছায় সেই গভীর রাত্রেও রুগী দেখতে এলেন। রাত্রে ডাক্তার ডাকলে যে রুগীর আত্মীয়েরা ডবল দর্শনী দেয়, অর্থশাস্ত্রের এই দার্শনিক নিয়মটা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারবাবু এসে গুটিকত ইন্‌জেক্‌সন্ দিলেন, তাতে রুগীর বেশ উপকার হ'ল। রুগী অনেকটা সুস্থ হ'লে, ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্রাদি পকেটস্থ ক'রে লছমনের কাছে হাত পাতলেন।

লছমন একটু মুস্কিলে পড়লো। সে ডাক্তারবাবুকে ডবল ফি দেবে বলে এনেছিল বটে, কিন্তু যখন সে দেখলে টাকাটা তার

নিজের পকেট থেকেই দিতে হচ্ছে, তখন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

হেমাঙ্গিনীর চোখে এটা বড় ভাল লাগলো না। এত রাত্রে ডাক্তার ডেকে পরের ঘাড়ে তাঁর দর্শনীর ভার চাপান যে মস্ত একটা হীনতার কাজ, এটা বুঝতে তার দেরি হ'ল না। লছমন তো একজন পর লোক, বিশেষ সে বাঙ্গালী নয়, একজন হিন্দুস্থানী, তার কাছে এই ভিক্ষা লওয়াটা তার প্রাণে বেজে উঠলো।

হেমাঙ্গিনীর হাতে গাছকতো রূপার চুড়ি ছিল। সে তাড়াতাড়ি সেগুলো হাত থেকে ছিনিয়ে বার করে ডাক্তারবাবুর সম্মুখে ধরে বললে : ডাক্তারবাবু! আমি বড় গরীব। আমার এই শেষ সম্বল রূপোর চুড়ি ক'গাছা আছে, এইগুলি আজ নিয়ে যান। এতে যদি আপনার ফি না পোষায়, কাল সকালে যেখান থেকে পারি, ধার করে আপনার টাকা দিয়ে আসবো।

লছমন কি ভেবে একবার নয়নের দিকে তাকালো। হঠাৎ দেখে, নয়ন চোখে আঁচল তুলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। তার প্রাণে এটা সইলো না। সে পয়সা বাঁচাতে জানে বটে, কিন্তু নয়নের চোখের জল দেখে সে জ্ঞানটা তার অস্পষ্ট হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চারটে টাকা বার করে ডাক্তারবাবুকে বললে : এই যে, হাম্ দেতা হায় আপ্‌কো ফিস্। এই লিজিয়ে বাবু! মায়ি, আপ্ চুড়ি রাখ দিজিয়ে।

হেমাঙ্গিনী অস্বীকার করে বললে : না, না, তুমি আর কতো দেবে বাবা? আমার চুড়ি ক'গাছা আপনি নেন ডাক্তারবাবু!

লছমন চুড়ি ক'গাছা মার দিকে সরিয়ে দিয়ে, জোর গলায় বললে : কিয়া করতা হ্যায়, মায়ি? হাম যব হ্যায়, আপ্‌কো কুচ্‌ পয়সাকো মুস্কিল নেহি হোগা।

লছমন আবার নয়নের দিকে ফিরে দেখলে, তার চোখ থেকে আঁচল নেমেছে। সে সেইটাকেই তার পুরস্কার বলে মেনে নিল।

(৮)

বাপের অবস্থা দেখে নয়নতারা তাঁর বিছানার পাশে বসে রইলো অনেকটা রাত্রি। হেমাঙ্গিনী স্বামীর শিয়রে বসে; সেও রাত জাগছিল। বিছানার অপর দিকে একটা মোড়ার উপর বসে লছমন একবার ঝিমুতে লাগলো, একবার বা উঠে ওষুধের শিশিটা এগিয়ে দিতে লাগলো।

ভোরবেলায় নয়ন কিন্তু আর পেরে উঠলো না। সমস্ত রাত্রির ঠেলা-খাওয়া ঘুম তার চোখ দুটোকে ডুবিয়ে দিতে লাগলো। তার মা তাকে ঢুলতে দেখে বললে : যা নয়ন! তুই একটু শুগে যা। আমিতো জেগে আছি। কত্তাও ত এখন একটু সামলে গেছেন!

নয়নের গা ভেঙ্গে আসছিল। সে মাতার আদেশ পাবামাত্রই আস্তে আস্তে উঠে মেঝের পাতা মাদুরের উপর গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

যেমনি শোওয়া, তেমনি ঘুম, কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না।

হঠাৎ এক সময় কি একটা অস্বস্তিতে তার ঘুমটা আচমকা ভেঙ্গে গেল। সে চমকে উঠে দেখে কার একখানা হাত তার গলায় জড়ানো।

অবিলম্বেই সে আবিষ্কার করলে, হাতখানা লছমনের এবং লছমন কোন্ সময় এসে তারই পাশে শয়ন করেছে।

নয়ন সবেগে লছমনের হাতখানা গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে: যাও! এখান থেকে সরে যাও!

লছমন ঘুমোয় নি, জেগেই ছিল। সে অতি মৃদুস্বরে বললে: চুপ্ চুপ্। মা এখনই জেগে উঠবে।

—উঠক গে। তুমি এখানে শুয়ো না বলচি। আমি ওসব ভাল-বাসিনে।...যাও, সরে যাও।

লছমনের ভারি অভিমান হ'ল। তবু সে চুপ করে শুয়ে রইলো। শুধু সে বললে: নয়ন? এত করেও তোমার মন পেলুম না! আমি কি এতই তোমার অগ্রাহ্যি?

নয়ন এ মিনতিতে একটুও নরম হ'ল না। সে কিছু কড়া উত্তর দিলে না বটে, কিন্তু তখনই সবেগে উঠে গিয়ে বাপের বিছানার উপর বসলো। মাথার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার মা কোলের উপর মাথাটি ঝুলিয়ে ঘুমুচ্চে। তার কোনও সাড় নাই।

নয়ন এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিল, মা'র এই ঘুমের সুযোগ নিয়ে লছমন তার পাশে গিয়ে শুতে সাহস করেছে। রাগ হলো খুব লছমনের উপর, কিন্তু তবু তার জন্যে যেন একটু করুণাও অনুভব করলো। আহা বেচারি! তাদের জন্যে অনেক করেছে!

লছমন খানিকটা চুপ করে শুয়ে থেকে, তার পর আস্তে আস্তে উঠলো। কি ভেবে, কোনও দিকে কিছু না তাকিয়ে, এমন কি নয়নের দিকেও চোখটা না ফিরিয়ে সে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

তখন বেলা বারোটা। কল থেকে দলে দলে মজুর মিস্ত্রি মজুরণী বেরিয়ে এলো, দুপুর বেলার খাবার ছুটিতে। লছমনও টলতে টলতে কাজ থেকে বাসায় ফিরে এলো।

আজ তার মনটা ভাল নয়। একে কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ, তার ওপর নয়নের গঞ্জনা তার সব আশার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। নয়ন যে এমনটা করবে, এ সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তার বাপের চিকিৎসার জন্তে সে কত টাকাই না খরচ করলো! সে সবের কি কোনও দাম নেই? একটা প্রতিদানও না?

এই সব পাঁচরকম ভাবতে ভাবতে সে বাসায় ফিরে এলো। দরজার কাছে এসে দেখে, নয়ন দাঁড়িয়ে। তার চোখে আঁচল, গাল দুটোয় চ'খের জলের ধারা লাইন দিয়ে গড়াচ্চে। লছমনকে দেখবামাত্র, সে একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

লছমনের সমস্ত অভিমান এক নিমেষে উপে গেল। নয়নের ওপর সমস্ত রাগ সে ভুলে গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো: কাঁদচো কেন নয়ন?

তুমি শীগগির এসো। বাবা কেমন হয়ে গিয়েছে।

সে কি? এই সকালে ত তিনি ভাল ছিলেন।

নয়ন আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। লছমন বললে: চলো দেখি কি হ'ল আবার!

হন্ হন্ ক'রে দুজনে নয়নদের বাড়ীতে এসে ঢুকলো। দরজার বাহির থেকেই লছমন শুনতে পেলে, নয়নের মা সকরুণ সুরে চিৎকার কচ্চে।

বুদ্ধু ফিরছিল বাসাতে। তার বাসা আর একটু পরে। সেও কান্না শুনে এদিকে এগিয়ে এলো।

লছমন ও বুদ্ধু দুজনেই কালি মিস্ত্রির ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে, মিস্ত্রির মুখ চোখ সব স্থির হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্চে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আর মোটেই বোঝা যাচ্চে না।

লছমনের চোখে জল এলো; সে সেখানেই বসে পড়লো। বুদ্ধু প্রবীণ লোক, কালি মিস্ত্রির অবস্থা দেখে বললে: এঃ! সব শেষ হো গিয়া!

হেমাঙ্গিনী মেঝেয় আছাড় খেয়ে চেঁচাচ্চে। নয়নও ঘরে ঢোকবা-মাত্র আছাড় খেয়ে পড়লো।

তাদের কান্না শুনে, লাইনের আরও অনেক বাসিন্দা এসে হাজির হ'ল। নবীন মিস্ত্রি, গয়ারাম, বেঙ্কটেশ্বর চেট্টি, সীতারাম পাঁড়ে, লাল বাহাদুর, চক্‌লু খাঁ ইত্যাদি অনেকেই এসে জড় হ'ল।

ঘণ্টাখানেক ধরে অনেক লোক এল, অনেক লোক গেল। এই এক ঘণ্টা হেমাঙ্গিনী আর্ত্তনাদে চিৎকার করতে লাগলো; নয়নও বার বার মূর্চ্ছিত হ'তে লাগলো; আর মূর্চ্ছাভঙ্গে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সমবেত সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করলো।

বেলা একটার সময়ে কল খুলবে, কাজেই সমবেত লোকের মধ্যে অনেকেই চলে যেতে সুরু করলে। তখন হেমাঙ্গিনী কান্না থামিয়ে কর্ত্তব্য-

বোধে উদ্বুদ্ধ হ'লো। স্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক শেষকৃত্যের যে তাকেই বন্দোবস্ত করতে হবে, এ জ্ঞানটা হঠাৎ চাবুকের মত এসে তার আর্ত্তনাদের সীমা নির্ণয় করে দিল।

নবীন মিস্ত্রি একে বাঙ্গালী, তার ওপর লাইনের সব বাসিন্দার মধ্যে প্রবীণতম। কাজেই তার দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনী বললে ঃ যা সর্ব্বনাশ আমার হবার, তাতো হয়ে গেল। এখন ওঁর শেষ কাজটা যাতে হয়, তার একটা ব্যবস্থা করুন।

নবীন মিস্ত্রি তার পাকা চুলের মাথাটি নেড়ে বললে ঃ তাই তো! কে কে তোমরা যেতে পারবে হে? শ্মশান ঘাটে ত নিয়ে যেতে হবে!

গয়ারাম একটা বিড়ি টানতে টানতে বললে ঃ আমি যেতে পারতুম, কিন্তু আমায় যে কাজে যেতে হবেই। নতুন সাহেব এয়েছে, তার কাছে কামাই করা চলবে না। বলতে বলতেই সে পেছন দিক ফিরে দরজার চৌকাঠে এসে হাজির হ'ল।

নবীনও কর্ত্তব্যবোধের তাড়নায় তার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে আরম্ভ করলো। অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে গয়ারামকে বললে ঃ আমারও যে কিছু ছোঁবার যো নেই! বাড়ীতে ওঁরা দু এক মাসের ভেতরেই যে আবার আঁতুড় ঘরে ঢুকচেন!

গয়ারাম হাতের আড়াল দিয়ে ফিক্ করে একটু হেসে বললে ঃ বলো কি দাদা? এখনও আঁতুড় ঘর চালাচ্চ?

নবীন অব্যাহত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলে ঃ সবই ভগবানের ইচ্ছা। তুমি আমি তাঁর হাতের পুতুল বইতো নই!

হাতের আড়াল অক্ষুণ্ণ রেখে গয়ারাম ঠিক সেই রকম মৃদুস্বরে আবার বললে : তাহ্'লেও, দাদা, তোমার এ বয়সে,—

নবীন তখন চোখ টিপে বললে : থাক্ থাক্, ও সব কথা এখন থাক্। চল আস্তে আস্তে সরে পড়ি।

হেমাঙ্গিনী সবিস্ময়ে দেখলো, বাঙ্গালী যে ক'জন ছিল, তারা সকলেই সেখান থেকে একেবারেই অন্তর্হিত। বাঙ্গালী ছাড়া আর যারা ছিল, তারাও কিছু উচ্চ বাচ্য না করে সরে যাচ্চে।

লছমনের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলো : কি হবে লছমন ? নবীন জ্যেঠামশাই, গয়ারাম খুড়ো সকলেই তো চলে গেলেন। এখন, ঘাটে নিয়ে যাবার কি হবে ?

লছমন এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে : তাইতো, ঘরতো একদম্ খালি হয়ে গেল। হাম্ এক আদমিতো শকেগা নেহি। বুদ্ধু ভাই ?

বুদ্ধু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বললে : আরে, হামলোক হিন্দুস্থানী হ্যায়। বাঙ্গালী আদমিকা মুর্দা হামলোক ক্যায়সে লে যাগা ?

লছমন উত্তর দিল : আরে হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালী ! লাস্ তো দরিয়া মে লে যানেই হোগা !

বুদ্ধু এক কথায় জবাব দিয়ে দিল। 'নেহি নেহি ভাই ! হাম্ বাঙ্গালীকো মুর্দা ছুঁয়েগা নেহি।'

হিন্দুস্থানী মনুশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বুদ্ধু সরে পড়লো।

সকলেই গেল, গেল না কেবল লছমন। সে অনেকক্ষণ বসে ভাবতে ভাবতে, এক সময় বললে : মায়ি ! একঠো খাটিয়া লে আই ?

হেমাঙ্গিনী বললেঃ তাই যাও বাবা! তুমি ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই!

লছমন দৌড়ে গিয়ে একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এলো। হেমাঙ্গিনী বললেঃ কি আর হবে? তুমি একদিকে ধরো, আর আমি একদিকে ধরি। শ্মশান ঘাটে তো নিয়ে যেতে হবে।

দুজনেই শব নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে গেল শুধু নয়ন্, কোলে তার কচি বোন্‌টাকে নিয়ে, আর মাঝে মাঝে চোখে আঁচলখানি রগড়াতে রগড়াতে।

(১০)

তোর জ্যেঠামশাই আর কাকার আক্কেলটা দেখছিস্‌তো নয়ন?

তাদের তুমি চিঠি লিখে সব জানালে, তবু তারা এলো না কেন মা?

এখন আসবে কেন? এখন যে দেখচে, কিছু পাওনা-থোওনার সম্ভব নেই। বরং উল্‌টে কিছু খরচ হ'তে পারে। যখন তোর বাবা ছিল, তখন হপ্তা পাবার ঠিক পরদিন তাঁরা কেউ এসে হাজির হতেন।

মা? চলোনা আমরা দেশে গিয়ে থাকি?

হেমাঙ্গিনী হাত নেড়ে বললোঃ কোথায় যাবি? সেখেনে কি আর আমাদের জায়গা আছে? তোর জ্যাঠা সব দখল ক'রে নিয়েছে।

আমরা গেলে, আবার সব ছেড়ে দেবে!

হ্যাঁ? তেমনি পাত্র সব? তুই যখন ছেলে মানুষ, তখন দু'চারবার

গিছ্লুম আমরা! ওরে বাবা! একটা ঘর ছেড়ে দিতো না দুদিন তরে থাকবার। উল্‌টে ওঁর কাছ থেকে সব লেখাপড়া করে নিলে। উনিও তেমনি দাতাকর্ণ! লক্ষ্মণ ভাইদের সমস্ত লিখে দিয়ে নিজে ফতুর হয়ে এলেন।

তা, আমাদের এখানে চলবে কি করে? নয়ন খানিকটা চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলো।

কি জানি বাপু কি করে চলবে? গতরে খাটা ছাড়াতো উপায় দেখি নে।

গতরে খাটার কথা শুনে নয়ন বিস্মিত হ'ল। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে গতরে খেটে কেমন ক'রে রোজগার কর্ব্বে সে বুঝতেই পারলে না।

হেমাঙ্গিনী বললে: ঠেকায় পড়ে সবই কর্ত্তে হবে বাছা! ...কাল গিছলুম রাম-এত্তোয়ারের বাড়ী দুটো চাল ধার করে আনতে। আমি স্বচক্ষে দেখলুম, তাদের দু'বস্তা চাল রয়েছে, তবু আমাকে মুখের ওপর বললে, 'কাঁহা চাউল মিলেগা? ঘরমে ত চাউল একদম নেই।' আমার বড় অপমান বোধ হ'ল বাছা, আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, হন্ হন্ ক'রে বাড়ী চলে এলুম।

তবে কাল চাল যোগাড় হ'ল কি ক'রে মা?

হেমাঙ্গিনী কপাল চাপ্‌ড়ে বললে: ও আমার পোড়ার দশা! তাও বুঝি জানিসনে? আমার সেই বিয়ের সময়কার রূপোর পাঁইজোর একটা ছিল না? সেইটে তখনই বার করে ছিরু স্যাকরার কাছে বিক্রি ক'রে দিয়ে এলুম না!

নয়ন কথাটা শুনে বড় বিষণ্ণ হ'ল। সে মাঝে মাঝে সেই পাঁইজোরটা

পরে পাড়ায় একটু আধটু বেড়িয়ে আসতো, সেটুকু আত্মপ্রসাদও বুঝি আজ থেকে শেষ হ'ল !

এত বড় আঘাতটা সে সহজে হজম কর্ত্তে পারলো না। মা'কে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্লেঃ অমন পাঁইজোরটা বিক্রি করে দিলে মা ? দেবার আগে আমায় একবার জিগ্যেসা করলে না ?

কেন ? তোকে জিগ্যেস করলে কি হতো ? তুই কি ঝনাৎ ক'রে পাঁচটা টাকা ফেলে দিতে পারতিস্ ?

নয়ন সংক্ষেপে বললেঃ দেখতুম একবার চেষ্টা !

অবহেলার সুরে হেমাঙ্গিনী বললেঃ হ্যাঁ ! তোর তো মোরদ ভারি ? মোল্লার দৌড় মস্জিদ্ অবধি ! তুই তো ঐ মেড়ো ছোঁড়াটার কাছে দুটো টাকা চেয়ে নিতিস্ ! আমার ওসব ভাল লাগে না বাপু !

কথাটা শুনে নয়ন বড় লজ্জিত হ'ল। মা তাহ'লে কিছু কিছু বোঝে ! নয়ন আর কোনো উত্তর না ক'রে রান্নাঘরে ঢুকলো কি একটা গৃহস্থালী কাজে।

(১১)

হেমাঙ্গিনী চুপি চুপি বুদ্ধু মিস্ত্রির বাড়ীতে গিয়ে তার 'বহু'কে ডেকে বললেঃ ও বউ ! তোমার মানুষকে বলে চটকলে আমায় একটা চাকরি করে দাও না ?

বুদ্ধুর 'বহু' তো বিশ্বাস করতে চায় না। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে নাকি নকরি কর্ত্তে পারে ? এটা যে একেবারেই অসম্ভব ! বললেঃ

দিদি? এ তোম্ কিয়া বাত্ বোলতা হ্যায়? তোম্‌লোক সুখী আদমি হ্যায়। তোম্ এত্না মেহন্নত শকোগে?

—হাঁ, হাঁ শকবো, শকবো। নইলে আমাদের পেট চলবে কি করে?

—মিস্ত্রি কুচ রাথ্ গিয়া নেহি?

—রাখলে আর তোমার বাড়ী এসে তোমার খোসামোদ করি!

—আচ্ছা, হামারা আদমিকো আনে দেও। ও আনেসে হাম্ উস্‌কো বোলেগা।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যেবেলা যখন অন্ধকার এসে পথ ঘাট ছায়ায় মুড়ে দিয়েচে, তখন হেমাঙ্গিনী নয়নকে কিছু না ব'লে আবার একবার বুদ্ধুর বাড়ী এল।

বুদ্ধু তার 'বহু'র কাছে সব শুনেছিল; কাজেই হেমাঙ্গিনী আসতেই বললে: আচ্ছা, কাল ফজিলমে হামারা সাথ কলমে চলো। স্পাত নম্বর তাঁত ঘরমে একঠো মরদানিকো দরকার আছে। হাম সাহেবকো বোলকে হুঁয়া বাহাল কর্ দেগা।

তখন ভোর পাঁচটা। শীতের রাত। তখনও কাক কোকিল উঠে উষার আগমনের সম্বাদ পৃথিবীতে ঘোষণা কর্ত্তে আরম্ভ করে নি। অন্ধকার তখনও লাইনের পথে ওত পেতে বসে আছে। এমন সময়ে চটকলের প্রথম বাঁশী বাজলো, আর লাইনের প্রত্যেক ঘরে উস্‌খুস্ শব্দ আরম্ভ হয়ে গেল। সকল মজুর, মিস্ত্রি, মজুরনী উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রস্তুত হ'তে লাগলো কাজে যাবার জন্যে।

হেমাঙ্গিনীর সমস্ত রাত ভাল ক'রে ঘুম হয়নি। তার মনে কেবলই আশঙ্কা জাগছিল, পাছে তার ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়। যখন প্রথম বাঁশীটা শীতের রাতের বুক চিরে তার কানে এসে পড়্‌লো, তখন হেমাঙ্গিনী তার গায়ের কাঁথাখানি পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার ছোট মেয়ে তার কাছে ঘুমুচ্ছিল, তাকে ভাল করে চাপা দিল। সে তখন ঘুমুচ্ছিল ; হেমাঙ্গিনী একবার শুধু তার পানে চাইলো। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চৌকিখানার দিকে তাকালো।

এই চৌকিতে আগে শুতো তার স্বামী ; এখন শোয় নয়ন। আজও সে শুয়েছিল। যখন হেমাঙ্গিনী উঠলো, তখন নয়ন বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাচ্ছিল।

হেমাঙ্গিনী মনে মনে তার ওপর ছোট মেয়ের ভার দিয়ে, আপনার পুরো কাপড়খানি ভাল করে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

অন্ধকারে অন্ধকারেই সে এলো বুদ্ধুর বাড়ীতে। তখন তাদের বাড়ীর বাহিরের দরজা বন্ধ। হেমাঙ্গিনী টিনের দরজায় করাঘাত করলো।

ভেতর থেকে বুদ্ধু জিজ্ঞাসা করলে : কোন্ হ্যায় ?

বাঙ্গালী রমণীর মৃদুকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী উত্তর দিল : আমি।

বুদ্ধু বললে : ও ! এসেছো ? আচ্ছা হামবি তৈয়ার হুয়া। যাতা হ্যায়।

একটু পরেই বুদ্ধু একটা ডিবের লণ্ঠন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। হেমাঙ্গিনীকে বললে : আও হাম্‌রা সাথ।

অন্য সময় হ'লে হেমাঙ্গিনী এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতের ভোরে, প্রায়

নির্জ্জন পথ দিয়ে, একজন মেড়ো পরপুরুষের সঙ্গে কোথায়ও যেতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ তার মাথায় ঘোমটার বালাইও নাই, মনে অনৌচিত্যের রেখাপাতও নাই। অভাব তার লজ্জাকে গলা টিপে তাড়িয়ে দিয়েছে, প্রয়োজন তার মনে সাহসের অঙ্কুর রোপণ করেছে।

(১২)

ছোট বোন্ কাজলের চিৎকারে নয়নের ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে দেখে, ঘরে মা নেই, কাজল মা'কে না পেয়ে পরিত্রাহি চিৎকার কচ্ছে।

নয়ন বিস্মিত হ'ল মাকে না দেখে। রোজই ত মা এসময় ঘরে থাকে, আজ গেল কোথায়? ভাবলে, বোধ হয় কোনও দরকার সারতে বাইরে গেছে। নয়ন উঠে কাজলকে ভুলাতে লাগলো, কিন্তু সে কিছুতেই থামে না!

অনেকক্ষণ কাটলো, তবু মা এলো না। তখন নয়নের মনে সন্দেহ হ'ল। সে উঠে বাড়ীর চারিদিকে খুঁজলো, কিন্তু মায়ের কোনও সন্ধান পে'ল না।

কাজল চিৎকার কচ্ছে, কাজেই তাকে কিছু খাবার দিতেই হবে। ঘরের চারিদিকে খুঁজে দেখলো, মা কিছু রেখে গেছে কিনা! নয়নের নজরে পড়লো, ঘরের এককোণে একটা বাটিতে ঢাকা কি রয়েছে। নয়ন ঢাকা খুলে দেখলে, বাটিতে কতকগুলো পান্তাভাত জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে। নয়ন পান্তাভাতগুলি নিংড়ে, কাজলকে খেতে দিল।

কাজল খানিকটা চুপ করলে বটে, কিন্তু তারপরে মা'র জন্যে আবার গলা ফাটাতে সুরু করলে। অগত্যা নয়ন তাকে কোলে নিয়ে, ঘরের শিকল টেনে, মায়ের সন্ধানে বাইরে বেরুলো।

লছমনের ঘরের দরজায় গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। তাহ্'লে সে কাজে গেছে। সেখান থেকে ফিরলো।

কোথায় যাবে ? গেল বুদ্ধুদের বাড়ী।

—ও বউ, মা কোথায় বলতে পার ?

বুদ্ধুর বউ বললে: আরে তেরি মায়ি কল্‌মে গিয়া নকরিকো ওয়াস্তে। তোম্ জানতা নেহি ?

—কই না। আমায় তো কিছু বলে যায়নি !

—কুচ্ নেহি বোলা ? এতো বড়া তাজ্জব হ্যায়।

—তুমি ঠিক জানো ?

—হাঁ, হাঁ, এইতো হামারা আদমিকো সাথ্ একদম ভোর রাতমে গিয়া।

—দেখ দিকিন্ একবার কাণ্ড ! আমি এখন কাজলকে কেমন ক'রে রাখি !

নয়ন গজর গজর করতে করতে বাড়িতে ফিরলো। কিন্তু কাজলকে রাখা হল এক দায়। সে তখনও মাকে না পেয়ে নয়নের কাণ ঝালাপালা করতে লাগলো।

কি বিপদ ! মা এমন একটা পয়সাও দিয়ে যায় নি, যে কাজলকে কিছু খাবার কিনে এনে দেবে ! অথচ খাবার না দিলে সে এক মুহূর্ত্ত চুপ করবে, এমন বলেও মনে হয় না।

বেলা ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো। কাজলের ভাত খাবার সময় হ'ল। অথচ ঘরে না আছে এক মুঠো চাল, না আছে হাতে একটা পয়সা। নয়ন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো।

কাজলকে আবার কোলে নিয়ে সে পায়ে পায়ে গেল হরি দোকানীর খাবারের দোকানে। সেখানে গিয়ে বললে: ও দোকানী কাকা? এক পয়সার মুড়ি মুড়কী দাও না! পয়সাটা বিকেলে দেবো।

হরি দোকানী বাঙ্গালী। খুব সাবধানী লোক। লাইনের মধ্যে দোকান ক'রে সে খায়। কারুব কাছে কিছু ধার পড়লে সেটা যতক্ষণ না আদায় হয়, আর তাকে ধার দেয় না। নয়নকে দেখে বললে: তোমার মায়ের কাছে আমি সাতটা পয়সা পাবো, সেটা আগে আনো, তবে ধার দিচ্ছি।

নয়নের আত্মাভিমানে একটু ঘা পড়লো। সে বললে: ওঃ! সাতটা পয়সাতো ভারি পয়সা! আমি বিকেলে দিয়ে যাব'খন।

দোকানী নিষ্ঠুর ভাবে উত্তর দিল: তবে বিকেলেই ধার নিয়ে যেয়ো!

নয়ন এ ব্যর্থ যাচ্ঞাটা সহ্য করতে পারলে না। মুখ বেঁকিয়ে দোকান থেকে হটে এলো।

কিন্তু কাজলতো থামে না! তখন সে কাজলের গালে দিল এক চড় বসিয়ে। মেয়েটা রাস্তার মাঝখানেই হাট বসিয়ে দিল। তখন নয়ন সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আবার, কালু দোকানীর তেলে-ভাজার দোকানে।

কালু হিন্দুস্থানী। লছমনের দোস্ত। সে নয়নকে চিনতো, এবং

কিছু কিছু খাতিরও করতো। লছমন নয়নের কথা তাকে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিল।

—ও দোকানি ? আমায় এক পয়সার কচুরি ধার দিতে পার ?

—আচ্ছা লে যাও। লেকেন এ পয়সা শোধ দেগা কোন্ ? লছমন দেগা, না তোম্ দেগা ?

নয়ন জোর গলায় বললে ঃ হাম দেগা। লছমন আবার কে ?

কথাটা শুনে কালু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নয়নের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর এক পয়সার কচুরি হাতে তুলে দিল। একটা ঠাট্টা করবে ভেবেছিল, কিন্তু করতে পারলে না।

কালুর দোকানের সম্মুখভাগে একখানা পেতলের থালায় তেলে-ভাজা চানা বিক্রির জন্য সাজানো থাকতো। নয়নের নজর পড়লো তার ওপর। সকাল থেকে দাঁতে কুটো করেনি, কাজেই তার পেট জ্বলে উঠলো চানা দেখে। সে কাজলের হাতে কচুরি দিয়ে বাসায় ফেরবার জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু পুনরায় ফিরে দাঁড়ালো। দোকানীকে বললে ঃ এক পয়সার ছোলাসেদ্ধও আমাকে দাও দোকানী।

একটা শালপাতার ঠোঙ্গায় চানা দিতে দিতে দোকানী সাহস করে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আচ্ছা, তোমারা সাথ্ কি লছমনকো সাদি নেহি হোগা ?

দূর মিন্‌সে ! বাঙ্গালীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর বিয়ে হয় ? বেশ রাগের ওপরই নয়ন এই উত্তরটা দিল।

দোকানী না দমে বললে ঃ আরে, দিল্ মে হোগা ত সব হোগা !

নয়ন সেখানে হয়তো আর একটু দাঁড়াতো, কিন্তু আর দাঁড়াল না।

কাজলকে কোলে নিয়ে দিল ছুট্। তার মনের মধ্যে একটা অপমানের শেল বিঁধলো।

বাড়ীতে এসে আবার কাজলকে রাখা দায় হ'ল। যতক্ষণ হাতে কচুরি ছিল, ততক্ষণ সে চুপ করেছিল; কিন্তু সেখানা ফুরিয়ে যেতেই খানিক পরে আবার আরম্ভ হ'ল ঘ্যান্-ঘ্যানানি।

নয়ন হাঁড়ি কলসী নেড়ে চেড়ে দেখলে, কোথায়ও একমুঠো চাল পড়ে নেই। সে রাগ করে পা ছড়িয়ে বসে রইলো; ওদিকে কাজল 'ভাত ভাত' করে দিগন্ত মাথায় কর্ত্তে লাগলো।

কি বিপদেই পড়লো নয়ন। প্রতিজ্ঞা করলে, মা এলেই আর তাকে কাজে যেতে দেবে না। কিন্তু, তাদের পেট চলবে কি করে?

আচ্ছা, লছমনের যদি এত সখ, তবে সে আমাদের টাকা দেয় না কেন?

না দিক গে! আমরা নিজেরাই গতর খাটিয়ে খাবো! তা বলে মেড়োকে বিয়ে করে কেন পাঁচজনের কাছে খেলো হতে যাব?

আচ্ছা, মেড়োকে বিয়ে করলে, দোষ কি? সমাজ? আমাদের এখানে সমাজ কৈ? আমরা কি দেশে বাস করি, যে সমাজের ভয় কর্ব্বো?

লছমন ছোঁড়া দেখতে মন্দ নয়! আর বেশ আশ্বাসে আছে। বিয়ে করলে আর কিছু হোক না হোক পেটের ভাবনাটা অনেকটা কমে! মা কি রাজি হবে?

এই রকম কত ভাবনাই নয়নের মনে আসছিল। এমন সময়ে কলের ভোঁ বাজলো বারোটার। কলে, খাবার ছুটি হ'ল।

একটু পরেই হেমাঙ্গিনী আপনার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরিধেয় বস্ত্র-খানি আগাগোড়া পাটের ফেঁসোয় আবৃত করে, ভূতের মত সেজে, এসে উপস্থিত। মুখখানা তার হয়ে গেছে যেমনি কালো, তেমনি ধূলোয় পরিপূর্ণ। চুলগুলো যেন একবেলাব মধ্যে হযে গেছে অর্দ্ধেক পাকা। নযন তাকে চিনতে পারলে অতি কষ্টে।

হেমাঙ্গিনী এসে কাজলকে কাঁদতে দেখে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গিযে, তাকে কোলে নিয়ে বললে: কাদচিস্ কেন মা? এই যে আমি এসেছি।

কাজল কিছুতেই তাব কোলে থাকবে না। বললে: মা কোথায়? তুমি মা নও।

হেমাঙ্গিনী ভুলিয়ে বললে: নাবে, আমিই মা। এই দেখনা আমার দিকে চেয়ে। আমায় চিনতে পাবছিস্ নে?

কাজল কাঁদতে কাঁদতে একবার তার মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু বললে: না, না, তুমি মা নও। তুমি ভূত।

—ভূত কিরে? আচ্ছা, এইবাব দেখ দিকি।

হেমাঙ্গিনী তখন আপনার মুখখানা ও মাথা থেকে পাটের ফেঁসো-গুলো সব ঝেড়ে ফেল্লে; খানিকটা জল নিয়ে চোখ নাক মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করলে। তখন কাজলের মুখে হাঁসি এলো। সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে: তুই সকাল থেকে কোথায় গিছলি মা? তুই কেন ভূত সাজলি? গান গাইতে গিছ্লি বুঝি?

—গান গাইতেই গিছলুম বটে। আমি যে রামযাত্রা করতে গিছলুম আমি যে অশোক বনের সীতা!

মেয়ে বললে: না তুই সীতা নয়, তুই মা। তুই আর যেতে পার্বিনে।

হেমাঙ্গিনী মেয়েকে ভুলিয়ে তাড়াতাড়ি নাওয়া খাওয়া সেরে নিল। কিন্তু তার আগেই কলের বাঁশী বেজে গেল। আবার কাজে যেতে হবে! কিন্তু কাজল তাকে ধরে বায়না ধরলে। সে কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না।

—লক্ষ্মীটি, সোণাটি, আমাকে ছেড়ে দাও মাণিক! কাজে না গেলে, টাকা আসবে কোথা থেকে? টাকা না হ'লে তোর খাবার মিলবে কি করে?

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। এত অর্থ-নৈতিক তত্ত্ব শুনেও কাজল হেমাঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরে বললে: না, আমি তোকে যেতে দেবো না। আমি তাকা তাইনে।

—টাকা চাইনে কি রে? টাকা চাইনে কি বলতে আছে?

কিন্তু কাজল সে নীতির প্রতিবাদ করে বললে: হাঁ, বলতে আঁতে। আমি কথ্‌খনো দেতে দেবো না।

হেমাঙ্গিনী নয়নতারার দিকে ফিরে বললে: নয়ন, তুই জোর করে ওকে একটু ধর্। কলের বাঁশী বেজে গেল। এখুনি না গেলে হয়তো রোজ কাটবে।

নয়ন মাথা নেড়ে বললে: বাবা, তোমার মেয়ে সমস্ত সকালটা আমায় যে ভোগান ভুগিয়েছে, আমি আর ওকে রাখতে পার্ব্বো না।

হেমাঙ্গিনী রুষ্ট হয়ে বললে: পার্ব্বিনে তো নগর চপর চলবে কি করে? তোর বাপ যে দাঁতে কুটো কাটতে রেখে যায় নি।

নয়ন এসব না বুঝে বললে ঃ তা আমি জানিনে। তুমি এই এখন কলে চললে, আর আসবে সেই সন্ধ্যে হয়ে গেলে! এতক্ষণ তোমার মেয়েকে রাখবে কে?

হেমাঙ্গিনী অতিষ্ঠ হয়ে বললে ঃ ওরে নয়না, তোর ব্যাগ্‌গাতা কচ্চি, ওকে একটু ধর্। নইলে কাল থেকে হাঁড়ি বন্দ হবে।

হোক্‌গে, বলে নয়ন আর কোনও কথা না শুনে ফর্‌কে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

হেমাঙ্গিনী পড়লো বিপত্তিতে। আজ থেকে সবে সে চাকরিতে বাহাল হয়েছে। রোজ পাবে পাঁচ আনা। এরই উপর আশা করে সে বাঙ্গালী মেয়ের লজ্জা ভয় সম্ভ্রম পরিত্যাগ করে, পাটের কলে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। নইলে, তার দুটি মেয়ে আর নিজে যে অনাহারে মরে!

কিন্তু কোলের মেয়ে কাজল যে তার কাল হলো। সে যে সেই মায়ের কোলে উঠে বসেছে, কিছুতেই নামবে না। বড় মেয়ে নয়নতারা সেয়ানা হয়েছে, কিন্তু মা'কে জব্দ করে বাড়ী থেকে বেরুলো। হেমাঙ্গিনী কেমন করে কাজে যায়?

মেয়েকে নিয়ে কলে যাবে? তা কি হয়? সেখানে বড় বড় চাকা ঘুরচে, নলি ছটকে ছটকে মানুষের গায়ে লাগবে, সেখানে কি ছোট মেয়েকে নিয়ে যাওয়া যায়? আর কলের সর্দাররা ছোট মেয়েকে কলের ভিতর নিয়ে যেতে দেবেই বা কেন?

কোনও উপায় না করতে পেরে, হেমাঙ্গিনী সেখেনে বসেই রইলো সমস্ত অপরাহ্নটা। চট কলে কাজ করা আর তার হ'ল না।

(১৪)

সন্ধ্যাবেলায় নয়নতারা ফিরে এসে মা'কে বললে : মা, বড় খিদে পেয়েছে। কি খাব?

কি আবার খাবি! ঐ উনুনে পাঁশ আছে, তাই খেগে যা!

জবাব শুনে নয়নতারারও বড় রাগ হল। সে মুখখানা ভারি ক'রে চৌকিখানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু কতক্ষণ শোবে? পেট যে কথা শুনতে চায় না। সে যত অভিমান করতে লাগলো, পেটের ক্ষুধাও ততো বাড়তে লাগলো। শেষে এমন হল যে, সে অভিমানকে মনের মধ্যে চাপা দিয়ে বাড়ীর বাহির হয়ে গেল।

বুদ্ধু সবে কল থেকে এসে মুখ হাত পা ধুয়ে বসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাদের আগড়টা কে খুললে।

'কোন্ হ্যায়?' বুদ্ধু খপর নিল।

—আমি, জ্যেঠামশাই।

'কে, লয়ন? কিয়া চাস্ রে?'

আমাদের চার গণ্ডা পয়সা আজ ধার দাও। আজ বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নি। সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

'হামলোক আর কেতো ধার দেবো বল্। কেত্তো চারগণ্ডা পয়সা যে তোর মা ধার বলে লে গেলো. সে কি শুধলো? হিসাব করলে পাঁচ রুপিয়াকো কম্‌তি নেহি।

কথা শুনে নয়নতারার বড় অপমান বোধ হ'ল। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই থানেই চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বুদ্ধু আরও বলতে লাগলো: তেরা মায়িকো হাম একঠো চাকরিমে লাগায় দিয়া,—ও এত্‌না অজবুক্ হ্যায় যে, বিকালমে চাকরিমে নেহি গিয়া। ও ক্যাইসে হামলোককো ধার শোধ দেগা?

নয়নতারা তবু কথা কইলো না। তার মনে হতে লাগলো, এই বুড়ো হিন্দুস্থানীটা তাকে জবাই কচ্চে। বুদ্ধু গলাটা আর একটু জোর করে জিজ্ঞাসা করলে: কি রে? তেরা মায়ি আজ কামমে ক্যাহে নেহি গিয়া?

নয়নের কান্না আসছিল। সে তবু গলাটা কোনও রকমে সাফ করে উত্তর দিলে: কাজলা যে বড় কাঁদতে লাগলো, তাই মা যেতে পারলো না।

যেতে পারলো না তো কি খাবে? রূপেয়া কাঁহাসে আসবে? ......তেরি মা'কো বল্‌গে, উস্‌কো নক্‌রি ছুট্ গিয়া।

আচ্ছা, বলে নয়নতারা ফিরলো। আর চারগণ্ডা পয়সার জন্যে বুদ্ধুকে জানালে না।

কিন্তু বড় খিদে পেয়েছে যে, কোথায় যায়?

লছমনের বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লে! লছমন তখন কাজ থেকে ফিরে, খানকতক রুটি বানাবার জন্যে সবে আটায় জল দিয়ে মাখতে বসেছে, এমন সময়ে নয়ন সেখানে গিয়ে হাজির। সে সম্ভাষণ করলে: কি হয়, লছমন?

এই দেখোনা নয়ন! কেত্‌না মেহনত করনে হোতা। কল্‌সে

আয়া ; কাঁহা একঠো ছুকরি রহেগা, হামারা রোটি টোটি বানায় দেগা, হাম মজাসে খায়েগা, না আপনা হাতমে সব বানানে হোতা।

এত দুঃখু কেন, তার চেয়ে একটা বিয়ে করো না! দেশে যাও, একটা ভাল দেখে দেশওয়ালী ছুকরি বিয়ে করে আনো।

না, দেশওয়ালী বিয়ে কর্ব্বো না। তুমি যদি দয়া করো,—

ব'লে লছমন প্রীতিমাখা মুখে নয়নের দিকে তাকালো। নয়ন লজ্জায় আপনার মুখখানা ফিরিয়ে বললে : দূর ছোঁড়া!

লছমন তবু বলতে লাগলো : কেন নয়ন, হামাকে কি দেখতে খারাপ?

নয়ন নির্লজ্জের মত উত্তর দিল : দেখতে খারাপ কেন? তুমি হলে মেড়ো, আর আমি হলুম বাঙালী। এ দু'জনে কি বিয়ে হয়?

লছমন তখনই তীক্ষ্ণভাবে প্রতিবাদ তুলে বললে : আরে, আমি মেড়ো আবার কোথায়? আমি বাঙালীর মত কথা কই, বাঙালীর মতো কাপড় পরি, সার্ট কোট গায়ে দেই, সাবাং মাখি, মাথায় লম্বা টেরি কাটি,—তবু আমি মেড়ো! না নয়ন, তুমি আর যা বলো, হামাকে মেড়ো বলে ডেকো না।

লছমনের কথা শুনতে শুনতে নয়ন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একটু হেঁসে নিল। পরে বললে : আমার জন্যে তুমি তোমার জাত বংশ সব ছেড়ে দেবে? তোমার দেশ-ওয়ালারা যে তোমায় একঘরে কর্ব্বে?

লছমন জোর গলায় বললে : তা করুক। হামি তো আর দেশে যাবো না। তোমায় যদি পাই, হামি এই খেনেই ঘর বাড়ী কর্ব্বো। হামায় সাদি কর্ব্বে না নয়ান?

নয়ন দেখলে, এ সময় যদি সে অস্বীকার করে, তাহ'লে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সে বললে : আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। এখন, আমার একটা উপকার করো দেখি লছমন !

— কি বলো। তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।

—প্রাণ এখন চাইনে। এখন আমায় দুটো টাকা ধার দাও। আমরা আজ সমস্ত দিন খাইনি।

—'বলো কি নয়ন ? হামাকে আগে বলো নি কেন ?' বলেই লছমন তড়াক করে উঠে তার তোরঙ্গ থেকে দুটো টাকা বার করে নয়নকে দিতে গেল। নয়ন হাত পেতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে।

লছমন সুমুখে দাঁড়িয়ে তার গাল দুটি আচম্বিতে টিপে দিয়ে বললে : তা হবে না। তোমাকে এখনই আমি যেতে দেবো না।

নয়ন মুখখানা জোর ক'রে সরিয়ে নিয়ে বললে : দূর হ' ছোঁড়া ! এখন কি আমার পিরিত কর্ব্বার সময় ? বলে, পেটে আগুণ জ্বলচে !

লছমন অপ্রস্তুত হয়ে বললে : আচ্ছা, হামি রোটি বানাচ্ছি, তোম যেতনা পারো, খা লেও।

—হাঁ, আমি তোমার ওই মেড়োর রুটি খাই ! বাঙ্গালী কি তোমাদের রুটি খেতে পারে ?

বলতে বলতে ফয়কে চলে গেল নয়নতারা। লছমন পেছন থেকে অনেকবার ডাকলো, কিন্তু সে আর উত্তর দিল না।

লছমনের মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। রোটি বানাতে আর তার হাত এগুলো না। সে কিসের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার মলিন শয্যার ওপর এসে শুয়ে পড়লো।

দেখ্ নয়না! ফের যদি তুই ঐ মেড়ো ছোঁড়াটার ঘরে একা একা যাবি তাহ'লে তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

কেন, তাতে হয়েছে কি?

হয়েছে কি? যেন কিছু জানেন না! নেকি! কোন্ ভদ্দর লোকের সোমত্থ মেয়ে—একটা উটকো মেড়োর ঘরে একা একা যায়?

তুমি শুধু শুধু বকোনা বলচি। কবে আবার আমি তার ঘরে একা গেলুম?

গেলিনে? কাল সন্ধ্যে বেলা যাস নি?

মেয়ে উত্তর দিল: কাল সন্ধ্যা বেলায় গিছলুম বলে তবে তো নপর চপর চলচে! দুটো টাকা আসতো কোথা থেকে?

হেমাঙ্গিনী আরও জ্বলে উঠে বললে: মুখে আগুণ টাকায়! অমন টাকার চেয়ে সাতজন্ম না খেয়ে থাকা ভাল। আমি বরং উপোস করে থাকবো, তবু তোর ঐ টাকা—চাইনে।......বলো কি, কি ঘেন্নার কথা! বুদ্ধুর বউ আমায় বলে কিনা, কাল সন্ধ্যে বেলা তোমার মেয়ে লছমনের ঘরে কি কর্ত্তে গিয়েছিল? মুখে আগুণ, মুখে আগুণ! পাড়ায় ঢিঢি-কার পড়বার যোগাড় হয়েছে!

মায়ের কথা শুনে নয়নতারা ঘেমে উঠলো! তবু দোষ কাটাবার জন্যে সে চট্ করে বললে: তুমি বললে না কেন, ঘরে পয়সা ছিল না, তাই দুটো টাকা ধার কর্ত্তে গিয়েছিল।

মা উত্তর দিল: তা কি আর বলিনি? তবু কে সে কথা বিশ্বাস করে? পাড়ায় আরও কতো মাগী সে কথা শুনলে! আবার ঐ নিয়ে না একটা গুলতান পাকায়! তুমি বাপু আর ওর বাড়ী ভুলেও যেয়ো না!

নয়নতারা বললে: আচ্ছা, আর কখনও যাবো না। কি পাড়া বাবা! টাকা ধার করতেও কোথাও যাবার যো নেই!

হেমাঙ্গিনী নরম হয়ে বললে: না। সোমথ মেয়ের টাকা ধার করতেও কোথায়ও যেতে নেই!

তবে আমি আজ থেকে দরজায় খিল দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকবো।

হেমাঙ্গিনী বললে: তাই থাকিস্। দু'মুটো জোটে বাড়িতে বসে, খাবি; আর না জোটে, শুখিয়ে উপোস করে থাকবি। তবু এর ওর তার বাড়ীতে যাবিনে।

নয়নতারার যেমন কথা তেমনি কাজ। সে তখনই তখনই বাড়ীর দরজায় খিল দিয়ে এসে ঘরের ভেতর বসলো। হেমাঙ্গিনী পা ছড়িয়ে গোটাকত সজ্‌নে পাতা বাছতে লাগলো।

সমস্ত দিন একরকম কাটলো। কাল দু'টো টাকা ভাঙ্গিয়ে নয়নতারা যে চালগুলো আর কিছু তরকারি এনেছিল, তাই সিদ্ধ ক'রে তাদের উদরের জ্বালা নিবারণ হ'ল। সমস্ত দিন নয়ন বাড়ীতে বসে রইলো, বাহিরে আর বেরুলো না।

লছমন বড় আশায় বুক বেঁধে কল থেকে ভাবতে ভাবতে আসছে যে, নয়নতারা আজও তার বাসায় ঠিক আসবে, কিন্তু ঘরে ফিরে প্রতীক্ষা করেও সে যখন নয়নতারার সাড়া শব্দ পেল না, তখন তার

মনটা বড়ই চঞ্চল হ'ল। সে আর থাকতে না পেরে নয়নতারাদের বাসার দিকে গিয়ে তাদেব দরজায় কড়া নাড়লো।

ভেতর থেকে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলো 'কে কড়া নাড়ে?'

আমি লছমন্!

কি চাও?

লছমন ঢোক গিলতে গিলতে, খাবি খেতে খেতে বললে: জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম যে—যে—আপনাদের আজকে খাওয়া দাওয়া কি হয়েছে?

হেমাঙ্গিনীর বদলে নয়নতারা উত্তর দিলে, "হয়েছে"।

আব কোনও দিক থেকে কোনও কথা নেই! লছমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখলে, কেউ দরজা খুললে না, তখন একটা বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আপনার বাসায় ফিরে এলো।

দুই তিনদিন নয়নতারার দেখা নেই। লছমন ভাবতে লাগলো: তার কি হ'ল? সেদিনকার সেই কাণ্ডতে বুঝি রাগ করেছে? আর দুদিন পরে অতোটা সাহস করলেই হোতো!

(১৬)

নয়নতারা অভিমান করে বাড়ীতেই বসে রইলো, কিন্তু হেমাঙ্গিনী পড়লো বড় বিপত্তিতে।

ঘরে চাল নেই, হাতে পয়সা নেই, অথচ তিন তিনটে প্রাণী কি করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে! পাড়ার লোক ধার দিয়ে দিয়ে এড়িয়ে

পড়েছে, হেমাঙ্গিনী আর তাদের কাছে অপমান সইতে পারে না।
ভিক্ষা ? হেমাঙ্গিনীর মাথা কাটা যেতে লাগলো সে কথা ভাবতে।

অথচ কি উপায় ?

কোন উপায়ই না করতে পেরে, শুধু সজিনা শাক সিদ্ধ করে, তাই খেয়ে, তারা গরু বাছুরের মত তিন দিন কাটালো।

আর হেমাঙ্গিনী থাকতে পারলে না। আবার বুদ্ধুর কাছে এসে কেঁদে পড়লো।

আমার আবার একটা চাকরি করে দাও।

বুদ্ধু রেগে বললে : যখন চাকরি করে দিলুম, তখন রাখতে পারলে না ! হাম আর চাকরি করে দিতে পারবে না।

এবারে আর চাকরি ছাড়বো না।

তোমকো সাহেব আর চাকরি দেগা নেহি। যো আদমি বাজে বাজে কামাই করতা হ্যায়, ও লোককো সাহেব কভি আউর কাম দেগা নেহি।

হেমাঙ্গিনী আপশোষে বললে : আমি নাক কাণ মলচি, আর কখনও এমন কাজ করবো না।

তব্‌বি নকরি হোগা নেই।

আচ্ছা, সাহেব আমায় না নেয়, আমার মেয়ের একটা চাকরি করে দাও।

কে, নয়না ? ও কলমে কাম করনে যায়েগা ?

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিল : যায়েগা নয় তো আর কি কর্ব্বে ? না খেতে পেয়ে আমরা যে মরতে বসেচি।

বুদ্ধু তখন মাথা নেড়ে বললে : হাঁ, ও করেগা ত উস্‌কো হাম একঠো নকরি দেনে শকেগা।

বেশ, তাহলে কাল থেকেই দাও। আর সাহেবকে বলে আগাম কিছু মাইনে দিয়ে দিতে বলো।

বুদ্ধু আবার গম্ভীর হয়ে বললে : কালসে হোগা নেই। আবি ত কুচ্ কাম থালি নেহি। যব থালি হোগা, তব্ তোমকো খবর দেগা।

তবু হেমাঙ্গিনীর বুকে খানিকটা বল এলো। সে বুদ্ধুকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে বাসায় ফিরলো।

কিন্তু শুধু আশায় পেট ভরে না। হেমাঙ্গিনী তার পরদিন আবার এলো, চাকরি হ'ল কি না খবর নিতে।

বুদ্ধু মুরুব্বির মত ভারি হয়ে বললে : আরে সবুর করো। এক রোজমে কভি চাকরি হোতা হ্যায় ?

তার পরেও চার পাঁচ দিন কাটলো। কিন্তু তবু বুদ্ধু একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারলে না।

পাঁচ দিনের দিন বুদ্ধু বললে : একঠো নোকরি ত খালি হুয়া। লেকেন, সর্দ্দার কুচ পান খানেকো মাঙ্‌তা হ্যায়।

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হয়ে বললে : ঘুস্ ? ঘুস আমি কোথা থেকে দেবো ? আমার হাতে ত একটি কাণা কড়ি নেই, যে দাঁতে কুটো কাটি।

বুদ্ধু বললে : দশ রূপেয়া ও আগাম মাঙ্‌তা হ্যায়। বোল্‌তা হ্যায়, যো উস্‌কো দশ রূপেয়া দেগা, উস্‌কো ও নকরি দেগা।

হেমাঙ্গিনী উত্তর করলে : হপ্তায় তো আড়াই টাকা মাইনে ! তার জন্যে আবার পান খেতে দিতে হবে ?

বুদ্ধু আক্ষেপ করে বললে : কিয়া বোলেগা ? আজকাল দিন হুয়া হ্যায় খারাপ, তা জানো ? হোসেনকা বহু ও কাম মাঙ্‌তা হ্যায়, বোলতা হ্যায় ও দশ রূপেয়া পান খানেকো দেগা।

হেমাঙ্গিনী ভেবে চিন্তে বললে : সর্দ্দারকে বলোনা যে মাইনে পেলে আমরাও না হয় পান খেতে কিছু দেবো।

বুদ্ধু ঘাড় নেড়ে বললে : তা হোবে না। সর্দ্দার আগাম দশ রূপেয়া মাঙ্‌তা হ্যায়।

হেমাঙ্গিনী কপালে হাত চাপড়ে বললে : তাহ'লে বলো, আমাদের চাকরি হবে না ?

ক্যায়সে হোবে ? কুচ্‌ তবিল বাহার করো, তব্‌ তো হোবে !

হেমাঙ্গিনীর বড় রাগ হ'ল। একেতো কুলিগিরি কাজ, তার ওপর আবার ঘুস্‌ দিয়ে কাজে ঢুকতে হবে। পোড়া কপাল—চাকরির !

সে রাগের চোটে বুদ্ধুকে দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে এলো।

বাড়ীতে এসে নয়নতারাকে সব কথা খুলে বললে। নয়ন শুনে বললে : ঝাঁটা মারো অমন চাকরির মুখে ! তার চেয়ে চলো আমরা দেশে যাই। সেখানে গিয়ে ঢেঁকিতে চাল কুটে আমাদের পেটটা চালিয়ে দেবো।

তাই চল্‌। এখেনে এই অপমানের চেয়ে দেশে না খেয়ে মরা ভাল।

কিন্তু মনটা স্বস্তি পে'ল না। দেশের অবস্থা তো হেমাঙ্গিনী জানে। আর সেখানে সর্ব্বস্ব তো তার স্বামী ভাইদের বিলিয়ে দিয়েছে। সেখানে গেলে কি তার ভাসুর দেওররা যায়গা দেবে ?

হঠাৎ হেমাঙ্গিনী নয়নকে জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা, লছমনকে

বলে দেখলে হয় না? সে যদি একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারে।

নয়নতারা উত্তেজিত হয়ে বললে: না, খবরদার না! তুমি যদি তাকে বলো মা, তাহ'লে আমি গঙ্গার জলে ডুবে মরবো। তুমি না তার সঙ্গে কথা কইতে অবধি আমায় বারণ করে দিয়েছ?

মেয়ের অভিমান দেখে হেমাঙ্গিনী আর কোনও কথা কইলো না।

(১৭)

চটকলের মজুররা যে সকল লাইনে থাকতো, সেইখানে একটা ঘর নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের (Trade Union) দল আফিস খুলেছিল।

কলের মধ্যে কাজ করতে করতে যে সকল মজুররা হঠাৎ সাংঘাতিক রকমে আহত হোত, বা জখম পেয়ে একেবারেই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়তো, তাদের হয়ে লড়াই করে এই ট্রেড্ ইউনিয়ন। কলের কর্তাদের কাছ থেকে অনেক খ্যাস্‌রাত এরা আদায় করে দিয়েছে অনেক গরীব মজুরকে। অনেকের মৃত্যু হলে এরা তাদের বিধবা স্ত্রী ও অনাথ পুত্রকন্যাদের জন্যে অনেক সময় কিছু মোটা অর্থ-সাহায্য আদায় করে দিয়েছে। এ সব খবর লাইনের মজুররা অনেকেই শুনেছিল।

একটা ছোট ঘরে একটা আম কাঠের টেবিল সম্মুখে রেখে একখানা ভাঙ্গা বেঞ্চিতে বসে একজন বাঙ্গালী যুবাপুরুষ বিড়ি টানছিল। তার পরণে ছিল একখানা খদ্দরের কাপড় ও গায়ে ছিল একটা [illegible] খদ্দরের পাঞ্জাবী।

কিন্তু খাটুনির দরুণ এরাতো বরাবর মাইনে পেয়েছে।

মাইনে কি পেয়েছে? আপনারা বছরে লাভ করেছেন কোটি টাকা; কিন্তু এই সব মজুররা আর মিস্ত্রিরা মাসে মাসে মাইনে পেয়েছে, কেউ পনেরো, কেউ দশ, কেউ বিশ টাকা। যারা জীবনের সমস্ত রক্ত দিয়ে আপনাদের কোটি টাকা লাভ করিয়েছে, তারা কি পরিবর্ত্তে শুধু ভাত কাপড় পাবার উপযুক্ত? তাদের ভবিষ্যতের জন্যে কি আপনাদের ব্যবস্থা করা উচিত নয়?

সাহেব খানিকটা ভেবে বললেন: তোমার কথা খুব যুক্তির বটে, বাবু! কিন্তু কি কর্ব্বো, আমাদের এ বিষয়ে এখনও তো কোনও ব্যবস্থা হয়নি।

হয়নি বললে তো হবে না সাহেব! আপনাকে এ বিষয়ে একটা সুবিচার করতেই হবে।

সাহেব বললেন: কলের তবিল থেকে আমি টাকাকড়ি কিছু দিতে পার্ব্বো না। তবে আমি নিজের পকেট থেকে পাঁচ টাকা ঐ বিধবাটিকে দিচ্ছি।

তাতে ওর ক'দিন চলবে সাহেব?

মিস্ত্রির বিধবাকে বলো না, আমাদের কলে চাকরি করুক। কিম্বা যদি ও'র ছেলেপুলে থাকে, তাদের বলো না, কলে কাজ করতে।

বাবুটি হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: সাহেব কলে চাকরি দিতে চান। আপনার কি সুবিধা হবে?

কি করে হবে বাবা? আমার কোলে একটি তিন বছরের মেয়ে আছে, তাকে বাড়ীতে রেখে আমি তো কলে কাজ করতে আসতে পার্ব্বো না।

আপনার কোনও ছেলেপুলে থাকে তো সাহেব তাকে চাকরি দিতে পারেন।

ছেলে তো নেই তবে মেয়ে আছে। সাহেব তাকেও যদি কিছু চাকরি দেন, তাহলেও দিন গুজরান হতে পারে।

সাহেব শুনে বললেন : বেশ কথা। তাহলে তাকেই পাঠিয়ে দিও। একটা চাকরি দেবো। আমি সর্দ্দারকে বলে দিচ্ছি, তোমার মেয়ে এলেই তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই সর্দ্দারকে ডেকে পাঠালেন। সর্দ্দার এসে সেলাম করতেই তাকে বললেন : সর্দ্দার ? কালি মিস্ত্রি মর গিয়া। উস্‌কো বহু আউর লেড়কি লোককো খানাপিনা মিলতা নেহি। উস্‌কো একঠো তাংড়া লেড়কি হ্যায়। উহিকো কুচ কাম দেও। কাম কুচ হ্যায় ?

সর্দ্দার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে : কাম একঠো হ্যায়। লেকেন আদমি ত একঠো লাগায় দিয়া।

সাহেব প্রভুর মতো হুকুম দিয়ে বললেন : উস্‌কো ছোড়ায়কে এ নকরিঠো ইস্‌কো দে দেও।

সাহেবের হুকুম। সর্দ্দার অমত করতে পারলো না! কিন্তু যে মর্দ্দানা পান খানেকো পাঁচ রুপেয়া ছোড়া, এই মুস্কিলে তার কি ব্যবস্থা কর্ব্বে, সর্দ্দার দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগলো।

—কিয়া, কুচ গোলমাল হ্যায় ?

—নেহি সাব, আপ্‌ যো বোলা, ঐ হোগা!

(১৮)

নয়নতারার চাকরি হ'ল। সে অনিচ্ছা সত্বেও রোজ ঊষাকালে ও দুপুরে কলে যেতে লাগলো। পেটের দায়! লজ্জা সম্ভ্রম সব তার কাছে ভেসে গেল বন্যার জলে কুটোর মত।

ভোরে যখন প্রথম কলের বাঁশী বাজতো, তখন নয়নতারা বিছানা ছেড়ে উঠে কলে যেতে লাগলো। যে দিন সে ঘুমিয়ে পড়তো, সে দিন তার মা ডেকে দিত সময়ে চাকরিতে হাজিরি দিতে।

কাজটা বড় নোংরা। কলে পাটের সুতো লাগান। বন্ বন্ করে চাকাগুলো ঘুরচে, তার সুমুখে দাঁড়িয়ে ছোটছোট নলিগুলিতে যোগান দেওয়া যে বেশ কঠিন কাজ, নয়নতারার তাতে সন্দেহ রইলো না। কিন্তু কি করে? আরও তো কতো বাঙ্গালীর মেয়ে ঐ কাজই করচে।

তাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হ'ল। কেউ বা ষোল বছরের, কেউ বিশ, কেউ পঁচিশ। কারুর সিঁথিতে সিঁদুর আছে, কারুর নাই। যাদের সিঁদুর আছে, তাদের স্বামী কম মাইনে পেতো, কাজেই সংসার চালাতে পারতো না। কাজেই স্ত্রীও চাকরি করতে এসেছে পাট কলে।

যাদের সিঁথিতে সিঁদুর নেই, তাদের কেউ বিধবা, কেউ কুমারী। বাড়ীতে কারুর বুড়ো বাপ আছেন, কিন্তু কাজ করতে পারেন না, একেবারেই অথর্ব্ব। ভাই কারুর কারুর আছে, কিন্তু তারা বড় বখাটে; কাজ করতে চায় না,—অথবা হয়তো কাজ করে, কিন্তু রোজগার এত

কম যে তাদের সংসারের সকল লোকের তাতে পেট ভরে না। এই রকম হতভাগ্যের ইতিহাস কম বেশী সকলের কাছেই পাওয়া যায়। নয়নতারা বুঝলো, সে পৃথিবীতে একাই হতভাগ্য নয়, আরও অনেক আছে। বিধাতার রাজত্বে দারিদ্র্য ও দুঃখ বড় কম অনুপাতে ছড়ান নেই।

এদের দেখে নয়নতারা অনেকটা সান্ত্বনা পেলো। সে তাদের সঙ্গে বেশ মিলে মিশে গেল, এবং নানা কথায় নানা গল্পে মজুর্ণীর জীবন কাটিয়ে দিতে লাগলো।

পাঁচী নলিতে সুতো দিতে দিতে বললে: তোমার নামটি কি ভাই?

আমার নাম নয়নতারা।

বাঃ! বেশ নাম। ... ... মানুষ আছে?

মানুষ কথাটার মানে নয়নতারা প্রথমে বুঝলো না, কিন্তু একটু পরেই বুঝলো। বললে: না দিদি. ও সব বালাই কাছে ঘেঁসতে দিই নে।

পাঁচী নথ নেড়ে বললো: বালাই কি গো? অমন ক[illegible] বলতে আছে? মেয়ে মানুষের ঐ বালাই-ইতো লক্ষ্মী!

নয়নতারা শুনে অবাক্ হ'ল। কথাটা যেন তার কাছে বেশ মজার ব'লে ঠেকলো।

পাঁচী আবার খানিকক্ষণ বাদে আরম্ভ করলো: খাটি খুটি সন্ধ্যে বেলায় বাড়ী যাই। তারপর খাওয়া দাওয়া ক'রে বিছানায় শুলে সেই মানুষটা কাছে না থাকলে ঘুম আসে না। এমন ঘুম পাড়াবার মন্তর জানে ভাই, সে আর তোমাকে কি বলবো?

কাজ করতে করতে নয়নতারার মুখ লাল হয়ে উঠলো। তারও মনে হতে লাগলো, এটা খুবই সম্ভব।

আমার মানুষটি আবার আমার খুব পোষ-মানা, বুঝলে নয়নতারা?

পোষ-মানা? তুমি কি দিদি, তাহ'লে পাখী পুষেছো?

তা ভাই যা বলো। পাখী ছাড়া আর কি? এমন তোতাপাখীর মত বচন ঝাড়ে, যে সমস্ত দিনের দুঃখু একেবারে ভুলিয়ে দেয়!

নয়নতারা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। বললে: আমাদের রাতে এমনিই ঘুম এসে যায়, দিদি!

কাছেই ছিল সৌরভী। সে কথায় যোগ দিয়ে বললে: পাঁচী দিদি ত একটা তোতাপাখী পুষেছে, আমি পুষেছি একটা বাঁদর! বুঝলে গো আমাদের নতুন সই?

সই উপাধিটা শুনে নয়নতারার আর আমোদ ধরে না। সে হো হো ক'রে হেঁসে উঠে বললো: ও আবার কি কথা বলছো তুমি?

এই বলচি, আমার যে মানুষটি আছে সেটি ভাই পাঁচী দিদির মানুষটির মত তোতাপাখী নয়। সেটিকে আমি পুষেছি একটা রূপী বাঁদর ব'লে।

নয়ন আবার হো হো ক'রে হেঁসে জিজ্ঞাসা করলো: কেন, বাঁদর কেন হ'তে গেল?

সৌরভী বললো: আর ভাই, কপালের গুণে। মিনষে না জানে বচন ঝাড়তে, না জানে শিষ দিতে। দিনরাত বসে বসে খাচ্চেন, আর আমাকে দেখলেই দাঁত খিচিয়ে কিচির মিচির কর্চ্চেন। পোড়া কপাল!

পাঁচী আর থাকতে পারলে না। সে বললে: পুরুষ মানুষ যদি অম্বুরেস হয়, তা হ'লে সেটা মেয়ে মানুষের দোষ। পুরুষ মানুষকে মানুষ করে তুলতে হয়, বুঝলি না সৌরভী?

সৌরভী সটান উত্তর দিল : না বুঝলুম না। আমরা তো পাঠশালার গুরুমশাই নই, যে বাঁদর পিটে মানুষ কর্ত্তে পারবো।

—তবে আর মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস্ কেন? ফোঁস ক'রে উত্তর দিল পাঁচী।

—জন্মেছি কি গুরুমশাইগিরি করতে?

—হাঁরে হাঁ! সময়ে হাতে বেত নিয়ে গুরুমশাইগিরিও করতে হয়, আবার সময়ে মেথরাণীর কাজও নিজ হাতে সারতে হয়। বুঝলি লো সৌরভী?

—কাজ নেই আমার গুরুমশাইগিরিও ক'রে, আর মেথরাণীও সেজে! তার চেয়ে আমার বাঁদর পোষা ভাল।

—তা হ'লেই ও দাঁতখিঁচুনি মাঝে মাঝে খেতে হবে!

এদের এই সরস বৈঠক আরও খানিকক্ষণ হয়তো চলতে পারতো, কিন্তু সব গোলমাল করে দিল বুড়ো সর্দ্দার এসে। সে একে পুরুষ মানুষ, তাতে লোহার বালা-পরা এক পাঞ্জাবী। মেয়েদের বৈঠক এ ছুটোকেই বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না।

সে এসে জলদগম্ভীর স্বরে বললো : এ মজুর্ণী লোক? তোম লোক বকর বকর করেগা, না কাম করেগা? ... তার হাতের বেতটা সে একবার নাড়াও দিল।

সব চুপ। নয়ন ভ্যাবাচাকা খেয়ে আপনার কাজে মন দিল। পাঁচী একবার অস্ফুট স্বরে বললে : যমের বাড়ী যানা মিনষে,—এখেনে, এয়েচেন মর্দ্দামি করতে!

(১৯)

শিখ-সর্দ্দার হাওয়াতে চাবুক মারতে মারতে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করলে। কোনও মজুর্নীকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে বকুনি দিলে, কারুকে বা সাহেবের কাছে রিপোর্ট করবে ব'লে শাসালে। তারপর, এদিক ওদিক ক'রে অন্য ঘরে চলে গেল।

তখন মজুর্নীরা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে। পাঁচী দিদি একটা লুকানো জায়গা থেকে তার কৌটাটা বার ক'রে, তা থেকে দু'টো সাজা পান নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিল। তারপর, কাপড়ের আঁচল থেকে খানিকটা দোক্তার পাতা বার ক'রে, সেটা হাতের তেলোয় গুঁড়িয়ে, মুখটা ওপর দিকে তুলে, প্রকাণ্ড একটা হাঁ ক'রে তার মধ্যে টিপে দিলে। কৌটাটা আবার বন্ধ ক'রে যথাস্থানে রেখে দিল।

সৌরভী এগিয়ে এসে বললে : কি দিদি, একা একাই পানটা খেলে? আমাদের দিকে একটা আধ'টা ছুঁড়ে মারলে না?

—'পান খাবে? তা খাওনা।'...ব'লে পাঁচী আবার তার কৌটা বার করলে। তা থেকে আর একটা পান নিয়ে সৌরভীকে দান-খয়রাত করলে।

নয়নের দিকে তাকিয়ে বললে : কি নয়নতারা? তুমি একটা খাবে নাকি?

নয়ন এখেনে নতুন কাজে লেগেচে, কাজেই তার লজ্জা হ'ল পান চেয়ে খেতে। সে বললে : না, পান খেয়ে কি হবে?

পাঁচী বললে : খেয়ে দেখো, তোমার ভগ্নীপোতের হাতের পান সাজা। তোতাপাখী পান সাজে মন্দ নয়!

নয়ন হেসে বললে : পানটা অবধি তিনি সেজে দেন? মানুষটি ভাল বলতে হবে তো?

—আর তুমি ভাই চোখ দিও না। ঐ ও আছে বলে, পাঁচী-দিদি এখনও বেঁচে আছে।...পান সাজা কি বলচো? আমি এই তো ছ'টা বাজলে তবে বাড়ী যাব! এর ভেতর তিনি দোকান বাজার করে রাখবেন, কুটনো কুটে, বাটনা বেটে, একেবারে তৈরি হ'য়ে থাকবেন। আমি গেলেই, উনুনে আগুণটি দিয়ে রাঁধতে বসবেন। তা বলতে নেই, মানুষটির রান্নার হাতও মন্দ নয়। পাঁচ তরকারি ভাত আমার জন্যে গরম গরম রেঁধে দিয়ে আমাকে নিজে পরিবেশন কর্বেন। তারপর আমার খাওয়া দাওয়া হ'লে, তবে তিনি দু'টি পেসাদ পাবেন।

সৌরভী কাছে ছিল। সে বললে : তারপর, তাঁর পা টেপার পালা? কেমন দিদি?

পাঁচী অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর করলে : তা বলতে নেই, সে দিকেও তোতাপাখী খুব ওস্তাদ। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন আমার পা'টি কোলে নিয়ে ঢুলতে থাকেন।

সৌরভী বললে : এই নইলে পুরুষ মানুষ! আমার রূপী বাঁদরটি বড় বদ্ মেজাজের! যদি বললুম, 'পা'টা একটু টেপোনা গা!' তিনি অমনি ফোঁস ক'রে উঠলেন; বলেন : পুরুষ মানুষ কি মেয়ে মানুষের পা টেপে?' আমি বলি, 'তাহ'লে তোমার নেশার পয়সা আর পাবে না!'

অমনি সুড়্ সুড়্ করে ভদ্দর লোক এসে আমার পাজোড়া কোলে নিয়ে বসেন!

পাঁচী-দিদি জিজ্ঞাসা করলো: কি নেশা করে?

সৌরভী উত্তর দিল: না, এমন কিছু খারাপ নেশা নয়! ঐ, কাছে বুড়োশিবের মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে ছিলিম কতক গাঁজা টেনে আসে। তা, সে আর কোন্ পুরুষ মানুষ না খায়?

—মদ টদ খায় না?

—হাঁ, মদ খাবে? পয়সা পাবে কোথায়? সেই আমি যতক্ষণে বার কর্ব্বো, ততক্ষণে তো? সে দিকে আমি খুব টঙ্ক!

নয়ন তো এ সকল কথা শুনে একেবারে অবাক্! এরা বলে কি? পুরুষ মানুষ পা টিপে দেয়, আবার রেঁধে খাওয়ায়? এমন কথা তো সে শোনে নি।

তখনও গল্প চলেচে। সৌরভী বলচে: হাঁ দিদি, তুমি এমন বেলোয়ারি খোঁপা রোজ কখন্ বসে বসে বাঁধো?

পাঁচী বললে: আমি নিজে বাঁধবো কখন্ ভাই? সেই বেঁধে দেয়! বাড়ী গেলেই, উনুন ধরাবার আগে আমার চুলগুলো নিয়ে বসে! কখনও বেলেয়ারি খোপা, কখনও মৌচাক, কখনও কাঁঠালি চাঁপা, কখনও মোহনচূড়ো,—এত রকম খোপা বাঁধতেও জানে সে! আবার মুখে বলাটি আছে, 'তোমার মাথায় খোঁপা-বাঁধা থাকলে, এমন সুন্দর দেখায় তোমায়,—যেন চোদ্দ বছরের ছুকরীটি!' আমি আর কি বলবো, মিন্‌সে যা বলে, কাণে শুনে যাই!

সৌরভী রসিকতা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে: খোঁপা বেঁধে দিয়ে পায়ের ধূলো নেয় না?

—দূর্ পাগলি! তাকে কি পায়ের ধূলো দিতে পারি? সে যে আমার গুরু লোক!

সৌরভী বললে: তা বটে! দিদির আমার ধর্ম্ম-জ্ঞানটি আছে!

জান্‌কী কাজ করে একই ঘরে। সে হিন্দুস্থানী। ভাল হিসেব বোঝে না। সে এসে বললে: পাচী দিদি, হামারা হিসেবঠো ঠিক কর্‌কে দেও তো ভাই।

পাঁচী বললে: কি হিসেব?

জান্‌কী বললে: ও হপ্তামে হামারা দোদিন কামাই হুয়া। হামারা মিলা, এক রূপেয়া সাড়ে চৌদ্দ আনা। কেত্‌না কাট্ লিয়া ভাই?

পাঁচী বললে: কই, আমার হিসেবের দস্তুরি দে। তবে তো বলবো। হিসেব কি অমনি হয়?

জান্‌কী একটা পয়সা বার ক'রে পাঁচীর হাতে দিল। পাঁচী অম্লান বদনে পয়সাটা আঁচলে বেঁধে বললে: আচ্ছা দাঁড়া। আমি বাইরে থেকে বিড়িটা খেয়ে আসি।

কলের ভেতর বিড়ি খাবার হুকুম নেই, সে জানতো। কাজেই কোমর থেকে একটা বিড়ি বার করে পাঁচী বাইরে গেল। অনেকটা সময় কাটলো। তারপর ফিরে এসে জান্‌কীকে বললে: বল্ তোর কি হিসেব।

পাঁচীর কাণে একটা পোড়া বিড়ি রয়েছে। নয়নের চোখ তার ওপর পড়লো। সে অবাক্ হয়ে গেল দেখে যে বাঙ্গালী মেয়ে মানুষ বিড়ি খায়! সে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলো: দিদি, একটা কথা জিগ্যেসা কর্ব্বো?

—কি কথা গো নয়নতারা ?

—তুমি মেয়ে মানুষ হয়ে বিঁড়ি খাও কেন, দিদি ?

পাঁচী দিদি উত্তর দিল : মেয়ে মানুষ তো কি হয়েছে ? মেয়ে মানুষ কি মানুষ নয় ? সারাদিন চট্‌কলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটবো, একটু-আধটু বিঁড়ি না টানলে থাকি কেমন করে ? তুমিও একদিন খাবে গো দিদি, তুমিও একদিন খাবে। এখেনে মাসকতক কাজ করো, তখন দেখবে আপনা থেকেই বিঁড়ি খেতে ইচ্ছে হবে। চটকলে এই গরম, সারাদিন ইঞ্জিন ঘুরচে, মাথার ওপর বড় বড় লোহার চাকাগুলো যমদূতের মত পাক খাচ্চে, এখানে থাক্‌লে যে মানুষ পাগল হয়ে যায় ! বিঁড়ি দোক্তা খেলে তবু একটু মাথাটা ঠিক থাকে। তাতে দোষ হয়েছে কি ?

দোষ যে কি হয়েছে, সেটা নয়নও ঠিক ধরে উঠতে পারলো না। তবু তার মনে হ'ল, মেয়ে মানুষের এটা না খাওয়াই ভাল। ও সব জিনিষ পুরুষের মুখেই শোভা পায়। মেয়েদের মুখে ? ছ্যা !

এটা তার জন্মগত সংস্কার। তবু সে বুঝলো, এ সংস্কারটা তাকেও হয়তো একদিন ভুলতে হবে। এ জায়গার গুণ ! আর সংসর্গেরও হয়তো কিছু ছোঁয়াচে দোষ আছে। তার মনে হ'ল, বোধ হয় এই জন্যেই গেরস্থঘরের মেয়েরা সহজে এখেনে কাজ করতে আসতে চায় না। তার আসাটাও বোধ হয় ঠিক হয়নি। কিন্তু সে কি কর্বে ? সে কি এখেনে ইচ্ছে ক'রে এসেচে ? পেটের দায়ে তাকে যে এখেনে আসতে হয়েছে।

পাঁচী দিদি ততক্ষণ মুখে মুখে কড়াগণ্ডার হিসেব ক'রে জান্‌কীকে

বুঝিয়ে দিলে যে, সর্দ্দার তার থেকে এক রোজের পয়সা ঠকিয়ে নিয়েচে। জান্‌কী শুনে, সর্দ্দারকে খুব গালি পাড়তে লাগলো।

সৌরভী জান্‌কীর গালি দেওয়া শুনে বললে : তবে আর কি, তুই যে রকম গালাগালি দিচ্চিস্, সর্দ্দার বাসায় গিয়ে মরে পড়ে থাকবে'খন।

জান্‌কী বললে : দেখতো ভাই শুঁড়ি, শালা কাইসান্ চোট্টা হ্যায়! (জান্‌কী সৌরভীকে সংক্ষেপে শুঁড়ি বলতো)।

সৌরভী বললে : ও আমরা অনেক দেখেচি। তুই এখন দেখ্।

পাঁচী কাজের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে সৌরভীকে জিজ্ঞাসা করলো : রোববার দুপুর বেলায় বাড়ী বসে কি করিস ? আমাদের ওখেনে তাশ খেলতে আসতে পারিস নে ?

সৌরভী বললে : কি ক'রে আসবো দিদি ? রূপী বাঁদর যে ছাড়ে না। সে সমস্ত দুপুর বেলা আমার মাথাটি নিয়ে উকুন বাছবে !

—বলিস কিরে ? তাহ'লেত খুব আরামে আছিস ? আমার তোতা পাখীর চাইতে ভাল। কি বলো নয়নতারা, সত্যি না ?

নয়নতারা হেসে বললে : আমিতো ও রসে বঞ্চিত দিদি, আমাকে ওকথা জিজ্ঞেস করে কি উত্তর পাবে ?

পাঁচী বললে : তা বটে! মাথা নেই, তার মাথা-ব্যথা! আচ্ছা, দুঃখ কি, আমরা তোমার একটা ঐ রকম মানুষ ঠিক করে দিচ্চি। তোমার মা-বাপ আছে ?

নয়ন দুঃখিত ভাবে বললে : বাবা নেই, মা আছেন। বাবা বেঁচে থাকলে কি আমাকে এই জায়গায় কাজ করতে আসতে হয় ?

পাঁচী দিদিও মুখটা একটু বিমর্ষ করে বললে: তা সত্যি, মাথার ওপর বাপ কি রোজগেরে ভাতার থাকলে মেয়ে মানুষের আর ভাবনা কি ?

এমন সময়ে কলের ভোঁ বাজলো। ছুটি হয়ে গেল। সকলে বাসায় ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

(২০)

সে দিন বাসায় ফিরে নয়নতারা রাত্রে মোটে ঘুমোতে পারলে না। যতবার চোখ বোজে, ততবার পাঁচীর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে উৎপাত আরম্ভ করে। আচ্ছা, পাঁচীদিদি যা বললে, তা কি সব সত্যি ? সত্যি তার মানুষটি কাছে না থাকলে রাত্রে ঘুম হয় না ? কই, আমার তো সে রকম হয় না! রোজই ত বেশ ঘুমোই। তবে আজ ঘুম হচ্চে না কেন কে জানে ?

পাঁচী দিদি জীবনে খুব সুখী। তার মানুষটি নিশ্চয়ই তাকে খুব ভালবাসে। দু'জনের মনের খুব মিল আছে, তাই তার কথায় মুখে হাসি ধরে না। সারাদিনের খাটুনি পাঁচী দিদি তাকে পেয়ে ভুলে যায়। আহা, এমন সৌভাগ্য ক'টা মেয়েমানুষের হয় ? আমারও তো অনেক দুঃখ! আমিও যদি ঐ রকম একটি মানুষ পেতুম, হয়তো সব দুঃখই ভুলে যেতাম! লছমনটা যে হিন্দুস্থানী, নইলে সে বোধ হয় আমার সব দুঃখই ভোলাতে পারতো।

খানিকক্ষণ বাদে নয়নতারা আবার ভাবতে লাগলো : লছমন তো আমায় চায়, আমিই তো তাকে ধরা দিচ্ছি নে। ধরা দিলে বোধ হয় মন্দ হ'ত না! হয়তো পাঁচী দিদির মত সুখী হতে পারতাম!

এ বয়সে একা একা কি থাকাও যায় ছাই? একটা মনের মত সঙ্গী না পেলে, কথা কয়ে জুড়োই কার সঙ্গে? লছমন মন্দ নয়, বেশ কথা কয়। কিন্তু মা'র যে মত নেই।

এই সব চিন্তা নয়নতারাকে সে রাত্রে বড়ই চঞ্চল করে তুললো। সমস্ত রাত্রেই প্রায় তার ঘুম হ'ল না। চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে এল, তখন কলের প্রথম বাঁশী বেজে উঠলো। বাঁশী শুনেই নয়নতারা ধড়ফড়িয়ে উঠলো।

কাপড়খানা গুছিয়ে প'রে, কলে যাবার জন্যে নয়নতারা বাসার বাহিরে এসে দেখে, লছমন তার দরজার সম্মুখে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে। নয়নকে দেখেই লছমন বললে : নয়ন, আমি তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

নয়ন কোনও কথা কইলো না, আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো; লছমনের কাছে এসে বললে : চলো।

দুজনে কলের দিকে চললো। রাস্তায় মিস্ত্রি মজুর যারা কলে যাচ্ছিল, তারা হয় একটু এগিয়ে, না হয় একটু পেছিয়ে ছিল।

যেতে যেতে লছমন বললে : চুপ করেই যাবে? কিছু কথাবার্ত্তা কও নয়ন!

কি কথা কইবো? নয়ন উদাসীন ভাবে উত্তর দিল।

এই তোমার চাকরির কথা! চাকরি কেমন লাগচে, বড় মেহনত্ হচ্ছে কিনা, এই সব।

মেহনত্ তো হচ্ছে, কিন্তু কি কর্বো ?

লছমন একটা ঢোক গিলে বললে : আমি ত বলচি, তোমার চাকরি কর্ত্তে হবে না, আমি তোমার ভাত কাপড়ের খরচ দেবো,—কিন্তু তুমি যে মোটে ঘেঁস দিচ্ছ না !

নয়ন শুনে কোনও কথা কইলো না, পথ চলতে লাগলো।

লছমন উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে : কোনও জবাব দিলে না যে নয়ন ?

নয়ন কথাটা গায়ে না মেখে বললে : দেখি কতদূর কি হয়।

—সে তো তুমি অনেক দিন বলছো। অথচ ঠিক জবাব তো একদিনও দাও না !...অথচ তোমার জন্যে আমিতো মরি !

—ও তোমার বাজে কথা ! সত্যি কথা নয় !

সত্যি নয় ? এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, সত্যি।

লছমন নয়নের গা ছুঁয়ে শপথ করলো। নয়নতারার সমস্ত শরীরে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠলো লছমনের স্পর্শে।

নয়নতারার যেন মনে হ'ল, মরুভূমির মত শুকনো তার জীবনে হঠাৎ একটা অমৃত ধারার স্রোত সে অনুভব কর্লো। এতদিন যে অভাবটা তার জীবনকে উদাসীন করে রেখেছিল, আজ এই মুহূর্ত্তে সেটা যেন আপনা থেকেই সরে যাচ্ছে।

পুরুষের স্পর্শ ! বিশেষ যে পুরুষ তাকে আপনা হতে যেচে সঙ্গী হতে চাইছে, তার স্পর্শ এত মধুর হয় ? এ একটা নূতন অনুভূতি হ'ল নয়নতারার।

নয়নতারা খানিকক্ষণ কিছু কথা কইতে পারলো না, আপনার মনের

সঙ্গেই সে বোঝাপড়া করে নিচ্ছিল, কিন্তু যখন লছমন আবার বললে : নয়ন, তোমাকে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। ইচ্ছে করে দিনরাত আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি,—তখন নয়নতারা আবার চমকে উঠলো একটা নতুন তৃপ্তিতে।

লছমন আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্মুখেই কলের বড় গেট এসে পড়াতে ওসব কথা একেবারেই বন্ধ কর্ত্তে হ'ল।

ছাড়াছাড়ির সময় এলো দেখে নয়নতারা বললে : দেখ লছমন! আমাদের ঘরের সর্দ্দারটা আমায় বড় জ্বালাতন কচ্ছে ; কি করি বলো দেখি!

কি বলচে সে সর্দ্দার ?

বলে কি,—তাকে দশটাকা কমিশন দিতে হবে, নইলে সে এখানে আমাকে টেকতে দেবে না। শুধু তাই নয়। তার চাহনিটাও আমার যেন কেমন একরকম বলে ঠেকছে।

ঐ বুড়োটা ? ওটা এত বদমায়েস ?

নয়ন বললে : আজকে তো হপ্তা নেবার দিন! ও বোধ হয় হপ্তা নিয়ে আমার সঙ্গে গোলমাল কর্ব্বে। বিকেলে তুমি একটু নজর রেখো তো, যদি কিছু জোর জবরদস্তি করে!

ইস্! জবরদস্তি কর্ব্বে ? তাহ'লে বেটার মাথা দুফাঁক করে দেবো না ? আচ্ছা তুমি যাও। আমি বিকেলে হপ্তা নেবার সময়ে হুঁসিয়ার থাকবো।

কলের দ্বিতীয় বাঁশী বেজে উঠলো। দলে দলে মজুর, মজুর্নী, মিস্ত্রি দৌড়তে দৌড়তে কলে ঢুকচে। নয়নও আর বিলম্ব কর্ত্তে পারলো না। ঐ অবধি কথা কয়েই কলের ভেতর ঢুকে গেল।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় হপ্তা হয়। ঐ সময়ে মজুর মজুর্ণী মিস্ত্রি সকলেই গত সপ্তাহের মজুরি পায়। সাধারণতঃ সর্দ্দাররাই টাকা বাটোয়ারা করে দেয়। অফিস থেকে হিসেবপত্র সব হয়ে আসে।

সেদিন শুক্রবার। নয়নতারা যে ঘরে কাজ করতো, সে ঘরের সর্দ্দার সেই শিখ বুড়ো টাকার থলি নিয়ে মজুর্ণীদের বিভাগ করে দিতে লাগলো।

অনেকগুলি মজুর্ণী জমেছে। সকলেই তাড়া কচ্ছিল, যত শীঘ্র হপ্তা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারে। নয়নতারা একবার ডেকে সর্দ্দারকে বললে: আমার আজ একটু তাড়া আছে, আমার হপ্তাটা আগে দিয়ে দাও।

সর্দ্দার কথাটা কাণে তুললো না। সে অপরাপর মজুর্ণীদের নাম ধরে ডেকে তাদের পাওনা চুক্তি করে দিতে লাগলো।

সকলে টাকাকড়ি হিসেব করে নিয়ে বাসাপানে ছুটলো। শেষে ডাক পড়লো নয়নের। তখন ঘর একেবারে খালি।

সর্দ্দার নয়নতারার দিকে তাকিয়ে বললে: হামারা কমিশন কো কিয়া হোগা? তোমারা হপ্তাসে আজ হাম দো রূপেয়া কাট লেগা। তোমারা হিসাব হোতা হ্যায় তিন রূপেয়া দশ আনা। উসিসে দো রূপেয়া হাম কাট্‌কে লেতা হ্যায়। আউর হপ্তামে বি ঐসাহি দো রূপেয়া কাটকে লেগা।

নয়নতারা বললে : আমি তা দিতে পার্ব্বো না। আমার বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না, আমি তোমাকে দু টাকা কি করে দেবো ?

বুড়ো শিখ সর্দ্দার বললে : ও সব বাত হোগা নেহি। সব কই দেতা হ্যায়, তোম কাহে নেহি দেগা ?

নয়নতারা বললে : তুমি তো আমার চাকরি করে দাও নি। তবে কেন আমি তোমাকে দশ টাকা কমিশন দেবো ?

শিখ তার প্রকাণ্ড জটা-পাকানো মাথাটা নেড়ে বললে : আরে যো কই তোমারা নকরি কর দিয়া, উস্‌মে কিয়া ? সর্দ্দার কো দস্তুরি তো জরুর মিল্‌না চাহি।

নয়ন রেগে গিয়ে বললে : তোমার জোর না কি ? তা হ'লে আমি ছোট সাহেবের কাছে নালিশ করিগে।

বুড়ো সর্দ্দার ভয় পাবার পাত্র নয়। সে বললে : আরে যাও তোম ছোটো সাহেবকো পাশ। ও সব সাহেব লোক হামারা মুঠাকো ভিতর হ্যায়।

নয়ন প্রত্যুত্তরে বললে : আচ্ছা আমি তাহ'লে চললুম সাহেবের কাছে। আমার হপ্তা তাঁর কাছ থেকেই নেবো।

বলে, পেছন ফিরে নয়ন ঘর হ'তে বেরিয়ে যায়। বুড়ো শিখ কি ভেবে তাকে ফের ডেকে বললে : আরে শুনো শুনো, একঠো রফা করো। আচ্ছা দেখো, এক কাম করো। হাম হামারা দস্তুরি একদম ছোড় দেতা হ্যায়। লেকেন তোম বোলো, হপ্তামে এক রোজ হামারা সাথ ফুর্ত্তি করেগা! (শেষ কথা কয়টা সর্দ্দার একটু চুপিচুপি বললে :

তারও সমীহ হ'ল এ প্রস্তাবটা সহজ গলায় বলতে। ব্যভিচার চিরদিনই একটু লাজুক হয়!)

নয়নের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো এই কথাতে। সে রেগে লাল হয়ে বুড়োকে বললে : তুমি যদি আমাকে ঐ সব বদ্‌মায়েসি কথা বলো, তাহ'লে আমি তোমার চাকরির মাথা খাবো সাহেবকে ব'লে।

একটা পিশাচের মত বীভৎস হাঁসি বুড়ো হেঁসে উঠলো। বললে : হা—হা - হা—আরে ছুকরি? তোমারা ত নসীব আচ্ছা হায়! হামারা মাফিক সর্দার কবি তোমারা পেয়ার হোনে শক্তা?

— বুড়ো মিনসে! আজ বাদে কাল গঙ্গার ঘাটে রওনা হবে! কাকে কি বলতে হয়, তা জানো না?

—আরে জানতা জানতা! গোসা হও কাহে পেয়ারী?

নয়ন মুখ বিকৃত করে বললে : গোসা হব না? বুড়ো হয়ে মরতে চলেচো, আমাকে ঐ সব কথা?

বুড়ো শিখ তবু নরম সুরে বললে : আরে, বুড়ো কোন্ আছে? হাম্? হা—হা—হাম্ তোমারা মাফিক দশঠো ছুক্‌রিকো এক রাতমে হামারা পাশ রাখ্‌নে শক্তা, জানতা হায়?

নয়ন কপালের ওপুর ভ্রূ তুলে বললে : সে যাদের রাখতে পারো, তাদের রাখতে পারো। আমাকে খবরদার তুমি ও সব কথা বলতে পার্ব্বে না।

—আরে, তোম হামারা দিলমে লাগ গিয়া; ঐ ওয়াস্তে বোলতা হায়। তোম্ বড়ি খপ্‌সুরত আছে, আউর কাঁচা উমোর, ঐ ওয়াস্তে

তোমকো মাংতা হ্যায়। আউর সব মজুর্নী-লোক হামকো পেয়ার কর্ত্তা হ্যায়, লেকেন ও লোক সব বুঢ্‌টী বন্‌ গিয়া, উসিসে ও লোককো ভালা লাগতা নেহি। তোম্‌ আও, গোসা হোতা হ্যায় কাহে?

নয়ন অধৈর্য্য হয়ে বললে: দেখবি মিনসে? এখনই চেঁচাবো?

কিন্তু বুড়ো বিচলিত হ'ল না। সে বললে: আরে, চেঁচাওগে তো কিয়া হোগা? আবি কলমে তো কই হ্যায় নেহি। সব আদমি তো ছুটি হোকে চলা গিয়া; সাহেব লোক বি তো আবি ভাগ্‌ গিয়া।

—তুমি এখনই আমার হপ্তার টাকা দেবে, কি না?

—আরে দেগা নেহি কাহে? হাম তো দেনে মাংতা হ্যায়। তোম্‌ হপ্তা বি লেও, আউর দো চার রূপেয়া লে লেও। লেকেন হামকো ফুর্ত্তি করাওকে তো যায়োগে?

নয়ন এবার আর সহ্য করতে পারলে না। বললে: দাঁড়াতো মিনসে, বাইরে গিয়ে সকলকে ব'লে দিই।

ব'লেই নয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে পেছন ফিরে দ্রুতপদে চললো। কিন্তু বুড়ো সর্দ্দার তখনই তার আঁচল ধরে ফেললে।

নয়ন জোর ক'রে তার আঁচলটা টানলে। বুড়োরও রোক চেপে উঠলো। সে জোর করে এগিয়ে নয়নকে গলা জাপ্‌টে ধরে, তার গালে সজোরে প্রীতির চিহ্ন দিতে গেল।

নয়ন প্রাণপণে তাকে একটা ঝাপটা মারলে। সর্দ্দার তখন আরও খেপে গিয়ে তার গলা ধরে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেললো। নয়ন যৎপরোনাস্তি শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো।

বুড়ো নয়নকে শেষ-অপমান কর্ব্বার জন্যে যেমনি সচেষ্ট হ'ল, অমনি

হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে অপর্য্যাপ্ত কিল ঘুষি মারতে আরম্ভ করলো। বুড়ো তখন উঠে নূতন আততায়ীকে ধরে তার মাথায় সজোরে এমন একটা ঘুষি মারলে, তখনই তার মাথা ফেটে রক্ত বের হতে আরম্ভ হ'ল। শিখ সর্দ্দারের হাতে ছিল লোহার বালা, তারই আঘাতে মাথাটা খানিকটা দু'ফাঁক হয়ে গেল।

সাময়িক মুক্তি পেয়েই নয়ন দিল এক ছুট। যে তাকে উদ্ধার করতে এসেছিল, সেও তাকে ছুটতে দেখে, রক্তাক্ত মাথা নিয়ে তার পিছন পিছন দৌড় দিল। নয়নের চীৎকারে পাছে কলের অবশিষ্ট লোকেরা শিখকে দোষী ব'লে সাব্যস্ত করে ফেলে. এই জন্য সর্দ্দার আর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে না। আপনার ঘরের মধ্যে থেকেই ভাবতে লাগলো, কাজটার পরিণাম কতদূরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

(২২)

তখন কল থেকে সব লোকই চলে গেছে। কলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ জনশূন্য এবং ভিতরকার কুঠী থেকে ফটক পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রাস্তা লম্বমান ছিল, সেখানেও একটি লোকও বর্ত্তমান ছিল না। ফটকের দরওয়ান পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময় বুঝে গুমটির ভিতর গিয়ে রুটি ডালের বন্দোবস্ত কচ্ছিল।

নয়ন যখন দৌড় দেয়, কারুরই নজরে পড়লো না। লছমনও যে তার সঙ্গে রক্তাক্ত কলেবরে দৌড় দিচ্চে, এর জন্য কারুকেই তাকে কৈফিয়ত দিতে হ'ল না।

বরং ফটক থেকে বেরিয়ে আসার পর পথে দু' একজন লোক তাকে দেখে সহানুভূতি ক'রে জিজ্ঞাসা কর্লো: কিয়া হুয়া ভাই? এত্না খুন কাহে?

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবার লছমনের তখন শক্তি বা সময় ছিল না। সে শুধু নয়নকে লক্ষ্য করে ছুট দিচ্চে।

বাসার দরজার কাছে এসে তবে দুজনে থামলো। লছমন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো: নয়ন? তোমারা কুছ জখম হুয়া নেহিতো?

নয়ন হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলে: জখম? ইস! হতভাগা মিন্‌সেকে তাহ'লে আস্ত রাখতুম নাকি?

এতক্ষণে নয়ন লছমনের দিকে চেয়ে দেখলো। দেখেই সে একেবারে আঁতকে উঠলো।

—এ কি! লছমন, তোমার গায়ে এত রক্ত কেন? উঃ? এ যে রক্ত'র নদী বয়ে যাচ্চে? কি সর্ব্বনাশ! তোমায় বুঝি ভারি মেরেছে!

লছমন সেখেনে বসে পড়ে বললো: বেটা মাথায় একটা ঘুঁষি মেরেছে, তাইতেই একদম জখম করে ফেলেছে!

নয়ন তার আঁচল দিয়ে লছমনের গায়ের রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে দেখে, সে যতো মুছিয়ে দিচ্চে, রক্তও ততো মাথা থেকে গড়িয়ে এসে পড়চে। সে ভয় পেয়ে বললো: কি হবে? রক্ততো এখনও বন্ধ হয় নি। এত রক্ত পড়লে বাঁচবে কেমন করে?

লছমন যে কেমন ক'রে বাঁচবে, সে প্রশ্নটা তার নিজের মাথায় এতক্ষণ ঠেলে ওঠে নি। কিন্তু নয়ন সে কথাটা বলতে, সে একটু দমে গেল। এতক্ষণ নয়নকে বাঁচাবার উৎসাহে সে একরকম্ চালিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু

এবার হঠাৎ তার মনে হ'ল, তার শরীর থেকে অনেকটা রক্তই বেরিয়ে গেছে।

গলার স্বরটা ক্ষীণ হয়ে এল। সেই ক্ষীণ স্বরেই সে বললে : নয়ন, আমার জন্মে ভেবো না। তোমায় যে সে শালা দুষমনের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছি, এই ঢের। হামি...একটু...শুই এখেনে।

বলতে বলতেই লছমন শু'লো সেখানে। নয়ন তা দেখে আরও ভয় পেলে।

সে লছমনের মাথায় আঙুল দিয়ে দেখতে লাগলো, জখমটা তার কোথায় আর কতো বড়ো। আঙুলে অনেকটা রক্তই লেগে গেল। চুলের ভেতরে সবটা ক্ষত দেখতে পাওয়া যাচ্চে না, তবু রক্ত মুছিয়ে যতটা নয়ন বুঝতে পারলে, তাতে বেশ বুঝলো, জখমটা অনেকটা আর এখনও সেখান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুচ্চে।

সে আতঙ্কে বললে : ওরে বাবা! এযে অনেকটা কেটে গেছে! এখনও গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্চে।

লছমন চোখ বুজিয়ে বললে : বেটার হাতে যে লোহার বালাটা আছে, উসমেই বহুত কাট গিয়া। যানে দেও! লেকেন ... উঃ! নয়ন? বড়া শির ঘুম্‌চে। আঁখমে সব আন্ধার দেখছি। তোম্ ... ডাগদারশে ...

আর বলতে পারলে না। লছমন প্রায় জ্ঞান হারালো।

নয়ন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, তার মা'কে ডাকলে : মা? মা? শীগ্‌গির বাইরে এসো! সব্বনাশ হয়েছে!

টিনের ঘরের ভেতরে হেমাঙ্গিনী রাঁধবার যোগাড় কচ্ছিল। আজ মেয়ে হপ্তার টাকা পাবে, সেই আনন্দে সে বাজার থেকে নানা রকম তরকারি

এনে সেগুলি কুটে, সবে রান্না চড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ নয়নের কান্নার শব্দ শুনে সে চমকে উঠলো। নয়ন ডাক দিতেই সে সব ফেলে রেখে বাইরে দৌড়ে এলো।

—ও মা! এ কি কাণ্ড গো? রক্তে যে ভেসে যাচ্চে! ও শুয়ে কে? লছমন?

—হাঁ মা। ওগো, কি হবে মা? লছমন কেমন করে বাঁচবে?

হেমাঙ্গিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো: ওকে অমন করে মারলে কে?

—ওই কলের সর্দ্দার! আমাকে বে-ইজ্জত করতে যাচ্ছিল, লছমন জান দিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছে। ওকে বাঁচাও মা তুমি!

—ও মা! সে কি কথা রে?' বলে এগিয়ে এসে হেমাঙ্গিনী সংজ্ঞা-হীন লছমনের কাছে বসে পড়লো।

নয়ন তখন লছমনের মুখ ও মাথা থেকে রক্তগুলো মুছিয়ে দিচ্ছিল আপনার আঁচল দিয়ে। বললে: বসো না তুমি মা। শীগগির ডাক্তার একজন ডেকে নিয়ে এস।

হেমাঙ্গিনী লছমনকে দেখে কাতর হ'লেও মুখ ফিরিয়ে বললে: ডাক্তার ডেকে আনবো? তার ফি দেবে কে?

—সে আমি বুঝবো'খন! তুমি যাও দেখি দৌড়ে। মানুষটাকে বাঁচাও দেখি।

মেয়ে নিজে রোজগার করে, কাজেই তার কথা হেমাঙ্গিনী ঠেলতে পারলে না। উঠে দাঁড়িয়ে বললে: আচ্ছা ভাতটা চাপিয়ে যাই দাঁড়া।

—না না, তোমায় ভাত চাপাতে হবে না। তুমি এক্ষুণি দৌড়োও। লছমন যদি না বাঁচে, আমি ও ভাত দূর করে ফেলে দেবো বলচি।

হেমাঙ্গিনী কথাটায় বড় সন্তুষ্ট হ'ল না। কিন্তু তবু মেয়ের আগ্রহে সে আর বাড়ীর ভেতর না গিয়ে, ডাক্তারের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। কাপড়খানা ছেড়ে যাবার একবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু সে ইচ্ছেটাও সে দমন করলো মেয়ের চোখের জল দেখে।

চানাচুর-ওয়ালা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে তার প্রকাণ্ড বাজরাটা মাথায় ক'রে। সে যেতে যেতে ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়ালো। কপালে ভ্রু তুলে সে জিজ্ঞাসা কর্লো: 'আরে! এ যে একদম খুন হুয়া। কিয়া হুয়া দিদিমণি?'

নয়ন চোখে আঁচল দিয়ে কান্নাটা সামলে নিয়ে বললে: তুমি ত ফেরি কর্ত্তে যাচ্চ, একবার পারো তো ডাক্তার বাবুকে ডেকে দিও না!

চানাচুর-ওয়ালা উত্তর করলে: হাঁ, হাঁ, জরুর ডাক দেগা! লেকেন কিয়া হুয়া?

নয়ন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে: একজন লোক ওকে বড় মেরেচে!

'এঃ! একদম খুন কিয়া!' চানাচুর-ওয়ালা অভিমত জানালে।

আরও যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তারা সকলেই একে একে এসে দাঁড়াল। তারা অনেকেই নয়নকে প্রশ্ন করে ব্যস্ত করে তুললো, কিন্তু নয়ন আর বড় উত্তর দিল না। তখন সকলেই ব্যাপারটা নিয়ে একটা মস্ত হট্টগোল আরম্ভ করে দিল।

বুদ্ধু একটু দূরে থাকে, সেও হট্টগোল শুনে দৌড়ে এল। সে ভিড়

ঠেলে যখন লছমনের কাছে এলো, তখন নয়ন কোথা থেকে একটু জল যোগাড় করে এনে লছমনের মুখে দিচ্চে। কিন্তু যখন জল চোয়াল বয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়লো, তখন সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বুদ্ধু বললে: হিঁয়া বাহারমে উসকো রাখ দিয়া কাহে? ভিতর মে লে চলো! ...ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দু' একজন পরিচিত লোককে ডেকে বললে: আও ভাই! তোম লোক হাত দেও, উস্‌কো ভিতর-মে লে চলো।

লছমনকে তাড়াতাড়ি বয়ে আনা হ'ল তারই বাসা ঘরে। চাবি ছিল তার পকেটে, নয়ন জানতো। সে লছমনের রক্ত-মাখা জামার পকেট থেকে চাবিটা বার করে তার বাসার দরজা খুলে দিল।

ঘরের চৌকিখানার ওপরে তাকে শোয়ান হ'ল। নয়ন বসলো তার মাথার কাছে, তার মাথাটা কোলে নিয়ে। একখানা ভাঙ্গা পাখা খুঁজে বার করে সে মাথায় হাওয়া করতে লাগলো।

কিন্তু হাওয়া কর্ব্বে কি, মাথার ক্ষত থেকে রক্ত পড়া যে বন্দ হয় না। নয়ন যতো মুছিয়ে দেয়, ততো রক্ত অবাধ্য-স্বাধীনতায় পড়তে থাকে।

নয়ন দেখে শুনে চোখের জল রাখতে পারে না। কাপড়ের আড়ালে সে অশ্রু বর্ষণ কর্ত্তে লাগলো।

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ছিল। সে বললে: অতো রক্ত বেরুচ্চে, দু'টি ঘাস ছিঁড়ে এনে, চিবিয়ে ঘায়ের মুখে লাগিয়ে দিলে বন্ধ হ'তে পারে।

ওষুধটা সে বাত্‌লালো বটে, কিন্তু এই সামান্য জিনিষটা সে যে নিজে ক'রে দেবে, এতখানি গরোজ তার ছিল না।

কিন্তু কথাটা শুনে নয়নের চৈতন্য হ'ল। সেওতো এ ওষুধের কথা জানে, তবে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্ না! হঠাৎ এত বড় একটা কাণ্ড লছমনের ঘটে যাওয়াতে সে এত বিবশ হয়ে গিয়েছিল, যে ওষুধটার কথা তার এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। ইস! এতটা ভুল হয়ে গেল নয়নের! সে মনে মনে বড় আক্ষেপ করতে লাগলো।

সে লছমনের মাথাটা কোল থেকে আস্তে আস্তে চৌকির ওপর নামিয়ে দিয়ে, উঠলো ঘাসের চেষ্টায়।

বাসার বাহিরে যেখানে বস্তির মাঝখান দিয়ে সাধারণের রাস্তা গিয়েছে, সেখানে এসে সে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো, কোথায় ঘাস পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তির রাস্তাটা ছিল ইট দিয়ে বাঁধান, কাজেই ঘাস কোথাও দেখতে পেলো না নয়ন।

চারি দিকে সন্ধান করতে করতে হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে সাধারণের জন্যে জলের কলটা আছে, তারই একটা পাশে বাঁধান মঞ্চের ধারে এক জায়গায় কতকগুলো ঘাস নিভৃত সুযোগে গজিয়ে রয়েছে। ঘাস রয়েছে বটে, কিন্তু তার জন্মভূমিটি বড়ই নোংরা। যত বস্তির লোক তাদের এঁটো বাসন মেজে, সেখানে ছাই আবর্জ্জনা ইত্যাদি ফেলে দেয়। হেন জাত নেই, যার এঁটো সেখানে পড়ে নেই। ও যায়গা থেকে কি ঘাস নিয়ে মুখে চিবুনো যায়?

নয়ন একবার আঁতকে উঠলো বটে ঐখান থেকে ঘাস নিয়ে মুখে দিতে; কিন্তু বেশীক্ষণ লাগলো না তার ঐ ঘৃণাটুকু জয় কর্ত্তে। হঠাৎ তার অন্তরের মানুষটি অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা করলো: লছমনের জান্ আগে, না ঐ আচার-বিচার আগে?

নির্ঘৃণভাবেই নয়ন দৌড়ে গিয়ে সেই নোংরা জায়গা থেকে ঘাসগুলি ছিঁড়ে আনলো, ও মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগলো। তার পরেই সেই চিবানো ঘাসগুলি মুখ থেকে বার ক'রে নিয়ে সে দৌড়ে গেল, লছমন যে ঘরে শুয়ে আছে, সেই ঘরে।

* * * *

কাছে গিয়ে লছমনের মাথা থেকে রক্তের চাপগুলি মুছে দিয়ে নয়ন চিবানো ঘাসগুলি ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল।

রক্তস্রাবটা তাতে অনেকটা বন্ধ হ'ল দেখে নয়নের মনে কি আনন্দ! সে তার মনের ঘৃণা দূর ক'রে, ঐ অপরিষ্কার পাঁচজাতের এঁটো-কাঁটা-মিশানো জায়গা থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে এসে, সব কুসংস্কার ত্যাগ ক'রে, সেগুলি নিজের মুখে চিবিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল বলেইতো রক্তটা বন্ধ হ'ল! সে এটা যদি না করতো, তাহ'লে আরও রক্তস্রাব হ'য়ে লছমনের এতক্ষণ কি হতো কে জানে! সন্নিক জাতের এঁটো-কাঁটা! সে পাপ একদিন গঙ্গাস্নান করলেই কেটে যাবে! কিন্তু এদিকে লছমন তো তার জন্যেই বাঁচলো! কি স্বস্তি! নয়ন মনে মনে পাড়ার কালি ঠাকুরকে পাঁচসিকে পূজোর মানত করলে!

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এসে হাজির হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও ঔষধপত্রাদি! সে সকল দিয়ে তিনি লছমনের ক্ষতস্থানটা সেলাই করে দিলেন ও রীতি মত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

সবই হ'ল, হ'ল না কেবল লছমনের জ্ঞান ফিরে আসা। ডাক্তারবাবু ইনজেক্শন করলেন, তবু লছমন পড়ে রইলো মৃতের মত।

তখন তিনি উপস্থিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন : ওর মগজে আঘাত লেগেছে। কিছু দিন ও অজ্ঞান থাকবে, জ্ঞান হবে ক্রমশঃ। আট দশ দিন কি আরও বেশী ওর রীতিমত সেবা করতে হবে, তবে ও জীবন ফিরে পাবে।

হেমাঙ্গিনী এগিয়ে এসে বললে : ওর আপনার বলতে কোনও লোকতো এখেনে নেই। কে ওর সেবা কর্ব্বে ?

ডাক্তারবাবু শোনবামাত্র বললেন, তাহ'লে ওকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও ; আমি চিঠি লিখে দিচ্চি।

নয়ন ভাঙ্গাগলায় বললে : হাঁসপাতালে ? সেখানে তো শুনেচি মানুষ বাঁচে না। না ডাক্তারবাবু, ও এখানেই থাক্। সেবা শুশ্রূষা যাহ'ক এক রকম ক'রে হয়ে যাবে।

হেমাঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়ে বললে : কি করে হবে ? কে দেখবে ? তুই দেখবি ? তুই সমস্ত রাত দিন ওর সেবা কর্ত্তে পার্ব্বি ?

নয়ন কথা কইলো না, চুপ করে রইলো। হেমাঙ্গিনী ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে বললো : ওর কথা শোনেন কেন ডাক্তার বাবু ? ও কি একটা মানুষ ? ও সেদিনকার মেয়ে, রুগীপত্তরের খিজমত কি জানে ?

বুদ্ধু দাঁড়িয়ে ছিল, সেও বললে : হাঁ, হাঁ, হাঁসপাতালমে ভেজ দিজিয়ে। উসকো নিরত্ রহেগা তো বাঁচ যাগা। নেহি রহেগা তো ঐ যায়গামেই যো কুচ হোনে দিজিয়ে।

নয়ন চোখটা পাকিয়ে বুদ্ধুর দিকে তাকালো।

লছমনের দোস্ত্ খাবার-ওয়ালা বললে : কোন্ দেখেগা, কোন্ শুনেগা ! হাঁসপাতাল দেনেসে সব দিক ঠিক হোতা হ্যায়।

তার দিকেও খানিকটা অগ্নিবাণ বর্ষণ ক'রে নয়ন বললে : আমি রুগীর ভার নিচ্ছি। আমি ওর সেবা-শুশ্রূষা সব কর্ব্বো। ওর কোনও আপনার লোক নেই বলে কি ও বেঘোরে মারা যাবে ?

হেমাঙ্গিনী বাঘিনীর মত গর্জ্জন করে বললে : আ মর নেকি ! ও মারা যায় তো তোর কি ?

নয়নও সারসীর মত মুখ বেঁকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে : মা ? তুমি কোনও কথা কয়ো না বলচি। একটা মানুষের প্রাণ কি জলে ভেসে আসে ?

'জলে ভেসে আসে না তো তুই যা ইচ্ছে করগে যা।' ব'লে গজ্ গজ্ করতে করতে হেমাঙ্গিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সব ঝগড়ার মীমাংসা করে দিলেন ডাক্তার বাবু নিজে। তিনি বললেন : আচ্ছা, এক কাজ করো। দিন কতক বাড়ীতেই রেখে দেখো। যদি এখানে ভাল ক'রে শুশ্রূষা হয়, ভাল কথাই। তা যদি না হয়, তখন হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

এই কথা বলে তিনি তাঁর বাক্সপত্র বন্ধ ক'রে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কেউ কোনও কথা কইলো না। এই ব্যবস্থাটাই যেন একরকম বাহাল হয়ে গেল।

যাবার সময় ডাক্তার বাবু বললেন : কৈ, আমার ফি কে দেবে ?

ফিয়ের কথা শুনে বুদ্ধু ঘাড়টা গুঁজে আস্তে আস্তে একজনের পিছনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের অন্য অন্য লোক সকলেই একে একে দরজার দিকে এগুতে লাগলো।

—"সব চললে কেন ? আমার ফিয়ের একটা বন্দোবস্ত করে যাও।" ডাক্তার বাবুর একথায় আরও সকলে দ্রুতপদে ঘরের বাহির হয়ে গেল।

"কৈ ? যে মেয়ে মানুষটি আমায় ডেকে এনেছিল, সে গেল কোথায় ?" ডাক্তার বাবু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন নয়ন বললে : আপনার ফি আমি দিচ্চি ডাক্তার বাবু! আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আমার বাসা থেকে এনে দিচ্চি।

ডাক্তার বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। নয়ন ত্বরিত গতিতে গিয়ে আপনার বাসা থেকে চারটে টাকা এনে ডাক্তার বাবুর হাতে দিল। তিনি টাকাটি পকেটে ফেলে আপনার ব্যাগটি হাতে ক'রে বিদায় হলেন।

ঘরে আর কেহই রইলো না, রইলো শুধু নয়ন একা।

তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। ঘরের মধ্যে অন্ধকার একটু একটু ক'রে জমতে লাগলো। নয়ন তা দেখে বেরিয়ে গিয়ে আপনার বাসা থেকে একটা হ্যারিকেন আলো জেলে নিয়ে এলো।

ডাক্তার বাবু একখানা কাগজে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখে রেখে গেছেন। সেটা ডাক্তারখানা থেকে আনতে হবে! কে আনবে ?

নয়ন রুগীকে একা রেখে বেরিয়ে গেল। লছমনের দোস্ত লাড়ু-ওয়ালাকে গিয়ে বললে : ওষুধটা না এনে দিলে ত তোমার দোস্ত্ মারা যায়!

কি ভাগ্য! লাড়ুওয়ালা রাজি হ'ল।

তারপর নয়ন এসে লছমনের মাথা কোলে নিয়ে বসলো। যাবার সময় লাড়ুওয়ালাকে বলে দিল, পাঁচসের বরফ আনতে।

বরফ ওষুধ দুই-ই এলো। নয়ন তখন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে একনিষ্ঠ হয়ে রোগীর সেবা আরম্ভ করলো।

(২৩)

তখন রাত্রি ন'টা কি দশটা হবে। হঠাৎ হেমাঙ্গিনী ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

—হাঁরা নয়না? তুই কি সত্যি সত্যি আজ এখানে সমস্ত রাতটা কাটাবি?

নয়ন উত্তর দিল: আমি কাটাবো না তো কি মানুষটা মারা পড়বে? আচ্ছা মা, তোমার মনে কি দয়া মায়া ব'লে কোনও জিনিষ নেই?

বিকৃতস্বরে হেমাঙ্গিনী বললো: ওরে আমার দয়া-মায়া রে! দয়া মায়া কর্ব্বার আর লোক পান না, ঐ লছমনের ওপরেই তাঁর যতকিছু? না?

নয়ন রেগে উত্তর দিল: তুমি অমন ঠেস দিয়ে কথা বলো না বলচি! আমি যা ভাল বুঝচি, তাই করচি।

মা উত্তর দিল: ঠেস্ দিয়ে কথা বলবো না? তুই কি কর্ত্তে বসেছিস, তা জানিস্? পাড়ার পাঁচজনে দেখলে কি বলবে?

নয়ন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: কি বলবে?

—বলবে না, অমুক মিস্ত্রির মেয়ে একটা মেড়ো ছোঁড়ার ঘরে রাত কাটাচ্ছে?

—বলুক গে, আমি অতো কারুর কথার ধার ধারি নে! কর্ব্বার সময় কেউ নেই, বলবার সময় অনেকে আছে!

—আছেই তো! তোর মত এমন অনাছিষ্টি তো কেউ করে না!

—অনাছিষ্টি কিসের! একটা লোক আমাকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে নিজে বেদম মার খেয়ে মরতে বসেছে! আমি মানুষ হয়ে কি ক'রে তাকে বিনা তদ্‌বিরে মরতে দেই ?

ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল, হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ শোনে নাই। কাজেই নয়নের কথাতে সে কৌতূহল-পরবশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে : কি ব্যাপারটা ঘটেছিল, ভাল ক'রে শুনি!

তখন নয়নতারা মা'র দিকে তাকিয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা বেশ রসান দিয়ে সবিস্তারে বললো। হেমাঙ্গিনী শুনে গালে হাত দিলে, বললে : বলিস কিরে, এত বড়ো কাণ্ড ঘটে গেছে, তুই আমায় এতক্ষণ বলিস নি ?

সময় বুঝে নয়নতারা বললে : তবে আর বলচি কি ? আজ লছমন না থাকলে আমায় সেই শিখ গুণ্ডার কাছে ধম্ম দিয়ে আসতে হোত!

—কেন, কলে কি আর মানুষ ছিল না, যে একটা ভালমানুষের মেয়ের ওপর এমন অত্যাচার হয় ?

—যারা ছিল, তারা তো কেউ আমায় বাঁচাতে এলো না।

—আচ্ছা কাল সকালেই আমি সাহেবকে বলে পাঠাচ্ছি, যাতে ঐ নোচ্চা শিখটার একেবারে জেল হয়।

—তা তুমি বলে পাঠাও। কিন্তু যে লোকটা আমার এত উপকার করেচে, আমি তাকে যমের হাতে ছেড়ে দিয়ে, পাড়ার লোকের মুখ বাঁচাতে পারবো না।

মা'র মনে চিরদিনই সন্তানের প্রতি যে করুণ ভাবটা অর্দ্ধনিদ্রিত থাকে, সেটা জেগে উঠলো হেমাঙ্গিনীর মনে নয়নের কথা শুনে। সন্তানের যে এতবড় একটা বিপদ ঘটতে বসেছিল, সে বিপদ থেকে যে

লোকটা তাকে ত্রাণ করেছে, তার ওপর খানিকটা সহানুভূতি এসে গেল হেমাঙ্গিনীর। সে অনেকটা নরম হ'ল, আর বিশেষ কর্কশ কথা নয়নকে বললে না।

—তবে আমি না হয় একটু রুগীর কাছে বসচি। তুই ততক্ষণ গিয়ে দুমুঠো খেয়ে আয়। সমস্ত দিন তো পেটে কুটো পড়ে নি, সেই দুপুর বেলায় যা দুটো হাতে মুখে করে গিয়েছিস!

নয়ন মার প্রস্তাব শুনে বললে: তা এক কাজ করো না? আমার ভাতের থালাখানা তুমিই না হয় আমাদের ঘর থেকে এখানে এনে দাও না?

—আমি আর বইতে পারিনে, সারা দিনের খাটুনির পর! তুই একবার যানা, খপ করে খেয়ে আয় না?

নয়নতারার পছন্দ হ'ল না। সে মুখ ফুটে বললে: আমি অমন রুগীকে ফেলে এক পা'ও নড়তে পারবো না।

— তোর বড় কুচ্ছিষ্টি বাপু, ঐ জন্যে বড় রাগ ধরে।

রাগ ধরুক, তবু মা রাগ দমন করলো। ঘর থেকে বেরিয়ে নয়নের জন্যে ভাতের থালা আনতে গেল।

আনবার সময়ে ঘটলো এক কাণ্ড! তার ঘর থেকে লছমনের ঘরে আসবার পথেই জলের কল। সেখানে বুদ্ধুর বউ এসে বাসন ধুচ্ছিল। একটা কেরাসিনের ডিবে জ্বলছিল পাশে।

বুদ্ধুর বউ হেমাঙ্গিনীকে ভাতের থালা বয়ে নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: ভাত লেকে কাঁহা যাতা বউ দিদি?

হেমাঙ্গিনী তার প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল। যতটা উপস্থিত

বুদ্ধি সম্ভব, তার জোরে সে বললে : কোথায় আর যাবো ? এই যাচ্চি যমের বাড়ী।

—যমের বাড়ী ? যম কি লছমনকো ঘরকা অন্দরমে র'তা হ্যায় ?

বিদ্রূপটা হেমাঙ্গিনীর গায়ে বেশ ভাল রকমই বিঁধলো।

বুদ্ধুর বউয়ের বাসন মাজা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে ডান হাতে বাসনগুলো তুলে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো : হাঁ বউ দিদি ? নয়ন কি আজ লছমনকা ঘরমেই রাত কাটায়গা ? পয়লা সাদি হোনে দেও, তব্ এ সব ঠিক হ্যায়।

কথাটাতে হেমাঙ্গিনীর সমস্ত শরীর রি রি ক'রে উঠলো। তার ইচ্ছে হতে লাগলো, ভাতের থালাটা ফেলে দিয়ে সে এক দৌড়ে কোথায়ও পালায়।

বুদ্ধুর বউ, হেমাঙ্গিনীর দিক্ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে, বাসন-গুলো নিয়ে আপনার ঘরের দিকে চলে গেল। কিন্তু যে শেলটা হেনে গেল হেমাঙ্গিনীর বুকে, তাতে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলো তার মনটা। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো তার ইতিকর্ত্তব্য।

পোড়া ভাত ! অমন মেয়ে নাই বা খে'ল একরাত্রি ! ওর মরণই ভাল। যার জন্যে পাড়ার একটা মেড়োর বউ অবধি তাকে ঠাট্টা ক'রে যায়, এমন মেয়ে বেঁচে থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি ? মুখের ওপর একটা খোট্টা মাগী বলে গেল কি না, 'সাদির পর এ সব ঠিক হ্যায় !' সাদি কিসের ? ঐ খোট্টা ছোঁড়ার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নাকি ? গলায় দড়ি !

"পয়লা সাদি হোনে দেও, তব্ এসব ঠিক হ্যায়!" বুদ্ধুর বউয়ের এই অভিমতটা ভিমরুলের মত বারবার তার মনকে হুল ফোটাতে লাগলো। বার বার ঐ একই কথা মনের মধ্যে উঠতে লাগলো অপরিসীম নিষ্ঠুরতায়, অসীম অপমানের প্রতিভূ হয়ে।

হেমাঙ্গিনী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেই আব্ছা অন্ধকারে ভাতের থালা হাতে ক'রে। পা আর কিছুতেই এগোতে চাইলো না লছমনের কামরার দিকে।

যতো ঐ সব কথা হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, ততো অপমানের সূক্ষ্ম বোধ তাকে আত্মহারা করে তুলতে লাগলো। শেষে হেমাঙ্গিনী ঘৃণায়, লজ্জায় ধীর পদে নিজের কামরায় ফিরে এলো। মেয়েকে ভাত দিয়ে আসা আর তার হ'ল না।

বাড়ীর ভিতর এসে দাওয়ায় বসে হেমাঙ্গিনী আরও কত কি ভাবতে লাগলো। শেষে এমন রাগ হয়ে উঠলো তার মেয়ের ওপর, যে প্রায় পাগলের মত হয়ে সে থালার ভাতগুলি আস্তাকুড়ে ঢেলে ফেলে দিল।

নিজেও কিছু খেলে না। দাওয়ার ওপর কোনও কিছু না পেতে সমস্ত রাত শুয়ে পড়ে রইলো মেয়ের ওপর অভিমান ক'রে।

(২৪)

ঘরের কোণে মিট্ মিট্ করে একটি প্রদীপ জ্বলছিল, আর সম্মুখে ছিল সেই মৃৎপ্রদীপের মতই ক্ষীণ নির্ব্বাণ-প্রায় একটি জীবন-রশ্মি। নয়ন সব ভয় তুচ্ছ ক'রে সাহসে বুক বেধে লছমনের পরিচর্য্যা কচ্ছিল। ডাক্তার ব'লে গেছে, মাথায় বরফের থলিটা অনবরত ধরতে, নয়নতারা সে উপদেশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন কচ্ছিল। নয়নের গা'টা ছম্ ছম কচ্ছিল সত্যি, কিন্তু তবু কোথা থেকে যে সে এত সাহস পে'ল, তা তার অন্তরের ঠাকুরই বলতে পারেন।

মা ভাত এনে দেবে বললে, কিন্তু কই এলো না ত? তবে কি আজ আর ভাত রান্না হয় নি? সে কথা তো মা বলে যাবে! কই, তাও তো বলে গেল না!

নয়নতারা আশায় আশায় অনেকক্ষণ রইলো, কিন্তু তার মা ফিরলো না। ব্যাপারটা কি ঘটলো, জানবার জন্য সে বড় উৎসুক হয়ে উঠলো। কিন্তু কি ক'রে রুগী ছেড়ে সে খবর নিতে যায়?

ক্ষুধা খুবই পেয়েছিল। সমস্ত দিন পাটকলের খাটুনি, তার ওপর লছমনের জন্তে দুশ্চিন্তা। এই দু'য়ে মিলে ক্ষুধাটাকে খুবই বাড়িয়ে তুলেছিল, কিন্তু এ ক্ষুধার শান্তি সে কি ক'রে কর্ব্বে? কর্ত্তে পারতো মা, কিন্তু সে তো হঠাৎ আসি ব'লে আর ফিরলো না। তা ব'লে কি রুগী ছেড়ে যাওয়া যায়?

ঘরে যে যমদূতেরা কিলবিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে লছমনকে নেবার জন্যে! একবার ফাঁক পেলেই যে তারা ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এমন এক মানুষকে, যাকে ভগবান সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নয়নতারার হাতেই জিম্মা রেখে দিয়েছেন! ভগবানের এ দান,—এ জিম্মা সে অবহেলা করে কেমন ক'রে?

ক্ষুধা? একরাত্রি না খেলে মানুষের কি হয়? সে তো মর্ব্বে না! কিন্তু যে সত্য সত্যই তার জন্য মরতে চলেছে,—তাকে বাঁচাতে গিয়েই যে আজ যমের কবলের মধ্যে অর্দ্ধেক প্রবেশ করেছে,—তার পরিচর্য্যা পরিত্যাগ ক'রে ক্ষুধা মিটোতে যাওয়া, সেটা যে হবে ঘোর কৃতঘ্নতা! ভগবানের বিরুদ্ধে হবে বিষম ষড়যন্ত্র!

এই সব চিন্তা নয়নতারার মনে এতো ঠেলে উঠতে লাগলো, যে সে একবারও উঠলো না লছমনকে ছেড়ে বাড়ীর দিকে যাবার জন্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যখন সে সত্যই দেখলো তার মা এলো না, তখন সে একবার উঠে দরজার খিলটা বন্ধ করে দিল, ও কতকগুলি বরফ ভেঙ্গে থলিতে পূরে লছমনের মাথায় দিতে মনোনিবেশ করলো।

(২৫)

সমস্ত রাত্রি চোখে ঘুম নেই, তবু হেমাঙ্গিনী একবারও উঠলো না। রাত্রে বস্তি একেবারেই নীরব হয়ে গেল, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর রাস্তার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ মাঝে মাঝে নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগলো। হেমাঙ্গিনী অবিচল হয়ে পড়ে রইলো দাওয়ায়।

মিস্ত্রির মেয়ে

কার্ত্তিক মাসের হিম এসে তার অঙ্গ শীতল করে তুললো; দাওয়ার ঠাণ্ডা তার হাড়গুলোকে চিবিয়ে খেতে লাগলো, তবু অভিমানিনী মাতা আত্মসুখের জন্য চেষ্টা করলো না। ঘরের মধ্যে ছোট মেয়ে কাজল কতবার ঘুম ভেঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, তবু হেমাঙ্গিনী উঠে তার কাছে গিয়ে শুলো না। সে কাঁদতে কাঁদতে আপনিই আবার ঘুমিয়ে পড়তে লাগলো।

শেষরাত্রে রহমন মুসলমানদের বাড়ীর মোরগগুলো ডেকে উঠলো, কলের বাঁশী বাজলো, মজুর ও মিস্ত্রিরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে কথা কইতে কইতে যেতে লাগলো, তবু হেমাঙ্গিনী সেই শীতল দাওয়ায় নীরবে নিস্পন্দভাবে শুয়ে পড়ে রইলো।

হেমাঙ্গিনী মনে ভাবলো, এইবার নয়ন বাড়ী আসবে কলে যাবার জন্যে কাপড় চোপড় ছাড়তে। অনেকক্ষণ সে আশায় আশায় চুপ ক'রে পড়ে রইলো, কিন্তু কলে যাবার সজ্জায় মিস্ত্রিরা সব একে একে পথ দিয়ে চলে গেল, তবু মেয়ে ঘরে ফিরলো না। তখন হেমাঙ্গিনী চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সকাল হতেই কাজলের ঘুম ভাঙলো। ঊষা-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে কাজল এসে দাঁড়াল মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে। তখন কাজেই হেমাঙ্গিনীকে উঠতে হ'ল।

কোথা থেকে একটা পয়সা খুঁজে বার ক'রে, কাজলকে কোলে নিয়ে হেমাঙ্গিনী বেরুলো খাবারের দোকানের দিকে। খাবারওয়ালা অভদ্র; সে জিজ্ঞাসা করলো: নয়নাকো মায়ি? কাল রাতমে লছমন কেইসন্ থা?

হেমাঙ্গিনীর পিত্ত জ্বলে উঠলো। সে আহত-পুচ্ছ ফণিনীর মত ফোঁস্ করে উঠে, উত্তর দিল : তা আমি কি ক'রে জানবো রে ড্যাক্‌রা মিনষে ?

ড্যাক্‌রা মিন্‌ষে ত অবাক্ নয়নের মা'র রাগ দেখে। যে মেয়ে মানুষ আজ বাদে কাল শাশুড়ী হতে চলেছে, সে ভাবী জামাইয়ের এত বড় অসুখের সময় এমন উত্তর দিতে পারে, এ সমস্যাটা খাবারওয়ালার কাছে বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগলো।

ঝাঁজের চোটে হেমাঙ্গিনী একলাফে বাড়ী এসে পৌছল। বাড়ীতে কেউ নেই, তবু বাহান্নটা লোকের সঙ্গে সে কথা কইতে আরম্ভ করলো। একবার সে মৃত স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, একবার বা তার উদাসীন দেওর-ভাসুরদের সঙ্গে খবরাখবর না নেওয়ার জন্য ঝগড়া করে। কখনও যায়েদের উদ্দেশ্যে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দেয়, কখনও আপনার কপাল চাপড়ে ভগবানের সঙ্গে তর্কাতর্কি আরম্ভ করে দেয়। কাজলকেই সে বসিয়ে দিল দুটো থাবড়া, সামান্য কি একটা কারণে !

শুখ্‌নো নিম গাছের মধ্য দিয়ে এসে যে সূর্য্যালোকটুকু গর্ব্বিত আস্ফালনে তার দাওয়ার উপর ঝক্‌ঝক্ করছিল, হেমাঙ্গিনী তার উপরেও হয়ে উঠলো মহা খাপ্‌পা। আপন মনেই বলে উঠলো : 'এতদিন তো এত সকালে ছড়িয়ে পড়ো না দাওয়ার ওপর, তবে আজ এত আস্পর্দ্ধা কেন ?' কিন্তু দুঃখের বিষয়, রৌদ্রেরা এর কোনও উচিত জবাব-দিহি করলো না।

কি ভেবে হেমাঙ্গিনী বকতে বকতে চললো লছমনের ঘরের দিকে। কাজল একা পড়েই কাঁদতে লাগলো বাড়ীতে বসে।

মিস্ত্রির মেয়ে

লছমনের ঘরের দরজা খুলেই হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলো নয়নাকে ঃ হাঁরে রাক্ষুসি, আজ আর বুঝি কলে-টলে যাবিনে ?

মা'র মুখে কর্কশ আহ্বান শুনে ও তার আলু থালু বিপর্য্যস্ত ভাব দেখে নয়ন প্রথমটা একটু ভয় পে'ল। কিন্তু সে যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছে, তাতে মা'র কাছে পরাজয় স্বীকার করা হবে না, এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা মনে মনে ঠিক করেছিল। লছমনের মাথার থলিটা নামিয়ে রেখে সে উত্তর দিল ঃ না, আমি দিনকতক এখন কলে যাবো না।

মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ঃ চাকরি থাকবে ?

নয়ন বললো ঃ না থাকে, না থাকবে। তা'বলে এ রুগীকে একা রেখে আমি কোথায়ও নড়বো না।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ লছমনের মুখ থেকে খানিকটা রক্তমাখান ফেনা বাহির হ'ল। নয়ন তখনই আপনার আঁচল দিয়ে সেটা মুছিয়ে দিয়ে বললে ঃ দেখ দেখি! এর কি অবস্থা! এ কি আর বাঁচবে ?

—না বাঁচে ত তোর কি ? তোর এত মাথা-ব্যথা কিসের রে হারামজাদি ?

—আমার মাথা-ব্যথা, ও লোকটা আমার উপকার করেছে ব'লে!

—শুধু উপকার করেছে ব'লে ? আর কিছু নয় ? আর তুই যে এই এতদিন ধ'রে ঢলাঢলি কচ্চিস্, সেটা কিছু নয় ? পাড়ায় যে ঢি-ঢি-কার পড়েছে, তার খবর রাখিস্ ?

সাপের মত ফোঁস্ ক'রে নয়ন জিজ্ঞাসা করলে ঃ কবে আমি ওর সঙ্গে ঢলাঢলি করেছি ?

হেমাঙ্গিনী বললে ঃ কবে নয় ? রোজ তো ভোরবেলায় দুজনে

একসঙ্গে কলে যাওয়া হয়! রোজই তো দু'জনে ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর হচ্চেই! আমি কিছু খবর রাখিনে? না?

মরিয়া হ'য়ে নয়ন বললো: খবর রাখো তো রাখো। কি কর্ব্বে? আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? তা দাও।

তবু তুই লছমনকে ছাড়বিনে?

না। এই জবাব শুনে রাখো।

তুই ওকে বিয়ে কর্ব্বি?

হাঁ, কর্ব্বো। তুমি কি কর্ব্বে?

বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে মেড়োকে বিয়ে কর্ব্বি? তোর গলায় দড়ি!

কেন, মেড়ো কি মানুষ নয়? তোমাদের মত তাদের হাত-পা নেই? তারা পয়সা রোজগার করে না? বউ-ছেলেকে খেতে দেয় না? তোমাদের মত এদের বুদ্ধি, বিদ্যে, ভালবাসা—এ সব কিছুই নেই?

হেমাঙ্গিনী মুখ বিকৃত ক'রে বললে: ওরে পোড়ারমুখি, ও যে ভিন্-জাত?

হলেই বা ভিন্-জাত। ও-ও ঈশ্বরের তৈরী মানুষ, আমিও ঈশ্বরের তৈরী মানুষ। ঈশ্বরের কাছে আবার জাত-অজাত কি?

বটে? তোর এই সব ভিটকেলমি হচ্চে? ভাল, তবে তুই ওকে নিয়েই থাক্। আমি এখান থেকে চললুম। আমি পাড়ার লোকের টিট্‌কারি সহ্য ক'রে তোর সঙ্গে এখানে থাকতে পার্ব্বো না। যেদিকে দু'চোখ চায়, সেই দিকে চলে যাবো।

তা যাও। কে তোমাকে বারণ কচ্ছে ?

তবু তুই ওকে ছাড়বি নে ?

না।

মা'র জন্যেও নয় ?

অতো জানিনে বাপু। আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্চি, আমি জীবন থাকতে লছমনকে ছাড়বো না। ও একটু ভাল হয়ে উঠলে ... আমি ওকে বিয়ে কর্ব্বো। তাহ'লে তো আর কেউ ঢলাঢলি বলতে পার্ব্বে না।

মা মেয়ের উত্তর শুনে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে রইলো। ক্রমে তার চোখ পাকিয়ে উঠতে লাগলো, একটা আগুণের ঝলক যেন তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরুতে লাগলো। শেষে মা বললে : রাক্ষসি ? তবে তুই থাক্ লছমনকে নিয়ে। আমি এই চললুম। আর ফিরবো না।

হেমাঙ্গিনী এই কথা ব'লে একেবারে ঝটিকার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নয়নতারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুমূর্ষু লছমনের মাথায় বরফের থলি ধরে রইলো।

* * * *

কত চিন্তাই তার মনে আসতে লাগলো। সেই মা, যে তাকে শৈশবকাল থেকে লালনপালন করেছে! সেই মা, যে তাকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরে শেষে কত কষ্টেই না পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে! আজ সেই মা অভিমান করে চিরদিনের মত ছেড়ে যেতে চলেছে। মনটা বড় খারাপ হ'ল। একবার ভাবলে, উঠে গিয়ে মাকে বুঝিয়ে

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তখনই লছমনের বিবর্ণ মুখখানি চোখে পড়ামাত্র মনের মুকুরে তার সমস্ত ভালবাসা প্রতিবিম্বিত হ'ল। আকুল লছমন অতীতের উপেক্ষার মধ্য থেকে যেন পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলো। নয়ন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো তার সমস্ত স্মৃতি নিয়ে।

একবার অভিমান-দিগ্ধ মাতৃস্নেহ আগুণ-ধরা মশালের মত তার মনের চক্ষু ধাঁধিয়ে দিতে লাগলো, আর একবার সম্মুখ দিকে ঠিক চোখের উপরেই অপরিতৃপ্ত ভালবাসার শীতল ঝর্ণা স্নিগ্ধ বারিরাশি নিয়ে তার পিপাসার্ত্ত মনকে লেলিহান করতে লাগলো। সংসারে অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা এই দুই বিরুদ্ধ টানের মাঝখানে পড়ে বর্ষা-প্রবাহাহতা বেতসীলতার মত কম্পিত হতে লাগলো।

নিয়তির অঙ্গুলিও তখন নিশ্চল ছিল না। নয়ন যখন এই রকম বিপর্য্যস্ত হয়ে বসে ভাবছিল, সহসা লছমন মুখটা খানিকটা হাঁ করলো, এবং অস্ফুট স্বরে সে যেন বললো ঃ একটু জল!

(২৬)

কোথায় গেল নয়নতারার মায়ের জন্যে উদ্বেগ,—মায়ের জন্যে দুশ্চিন্তার মেঘরাশি! লছমনকে মুখ খুলতে দেখে সে আকুল হয়ে তার মুখের কাছে আপনার কাণ ধরলো এবং স্পষ্ট যেন শুনলো সে জল চাইচে!

তাড়াতাড়ি উঠে একটি কলসী থেকে জল গড়িয়ে, নয়ন লছমনের

মুখে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দিল। লছমন প্রথমটা তা পান করতে পারলো না, মুখের জল মুখেই রয়ে গেল। নয়ন তা দেখে লছমনের চোয়ালটা উঁচু করে ধরলো এবং তার নাম ধরে জোর করে ডেকে বললো: লছমন, জল খাও, জল দিয়েছি।

অনেক বলতে বলতে, অনেকক্ষণ চোয়াল ধরে নাড়তে নাড়তে, তারপর লছমন জলটুকু গলাধঃকরণ করলো। তা দেখে নয়নের কি আনন্দ! তার মা ফিরে এলেও বোধ হয় এত আনন্দ হ'ত না!

কিন্তু দ্বিতীয় বার ডাকতে লছমন আর সাড়া দিল না। তখন নয়ন আবার লছমনের বুকের ওপর আছড়ে পড়লো।

তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। আকাশের রৌদ্র পৃথিবীতে নেমে বেশ ইজারা নিয়েছে। বুদ্ধুর বউ সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে একবার ভাবলে: "বাঙ্গালীদের মেয়ে নয়না কাল রাত্রে লছমনের ঘরে কাটালো কি না একবার দেখে আসি!" তার বড় কৌতুহল হচ্ছিল, নয়না কি কচ্চে সেটা দেখবার জন্যে।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে এসে বুদ্ধুর বউ লছমনের উঠানে দাঁড়ালো। সম্মুখেই লছমনের ঘর। কিন্তু ঘরের দরজা ভেজান। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই; এ বাড়ীতে যে কেউ আছে, একেবারেই বোঝবার যো নেই। কিন্তু কৌতুহল তো এসকল বাধা মানে না। সেটা কখনও হয় চোরের মত, কখনও হয় ডাকাতের মত। তার সাহসও যেমনি নির্লজ্জ, লজ্জাও তেমনি অসমসাহসিক। বুদ্ধুর বউ এই কৌতুহলের উত্তেজনায় হঠাৎ খুলে ফেললো লছমনের ঘরের দরজা।

খুলে যা দেখলে, তাতে বুদ্ধুর বউ প্রথমটা একটু ভয় পেল। লছমনের বুকের ওপর নয়না মাথা রেখে কাঁদচে। চোখের জলে তার গালে বাঁকা বাঁকা দাগ পড়েচে। ঠোঁট দু'টি খুবই ফুলে উঠেছে, আর মাথার সুমুখ দিক্‌কার চুলগুলো একেবারেই পাগলা হয়ে মুখখানাকে ভচনচ করচে।

এই অবস্থাটা দেখে বুদ্ধুর বউয়ের সন্দেহ হ'ল, বুঝি লছমন মারাই বা গেছে! সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে নয়নকে সহানুভূতির সুরে ডাকলো: নয়না, ও নয়না?

নয়ন ধড়ফড় করে উঠে দেখে, সম্মুখে বুদ্ধুর বউ দাঁড়িয়ে। বড় রাগ হ'ল। বললে: কি! মজা দেখতে এসেছো?

এ কথায় কোনও সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বুদ্ধুর বউ জিজ্ঞাসা করলো: লছমন আজ ক্যায়সা হ্যায় ভাই?

তার কথা কি সহানুভূতি-মাখা! নয়না এর পর আর তার ওপর রাগ বজায় রাখতে পারলো না।

(২৭)

আটদিন লছমনের দরজায় অনবরত ধাক্কা দিয়ে মানুষের অন্তিম দেবতা ফিরে ফিরে গেল।

নয়নতারা অক্লান্ত পরিশ্রমে এ কয়দিন লছমনের সেবা কচ্ছিল। কিন্তু রাত জেগে জেগে আর সে বুঝি পেরে উঠছিল না। পাড়ার কেউ আর উঁকি মারে না, শুদ্ধু বুদ্ধুর বউ দিনের ভেতর মাঝে মাঝে

আসে, আর তাদের খবর নিয়ে যায়। এ কয়দিন উপবাসেই প্রায় কাটছিল, শুধু বুদ্ধুর বউ দয়া করে এক আধথালা ভাত এনে দিয়ে নয়নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। লছমনের যে সকল পুরুষ বন্ধু ছিল, তারা উঁকি ত মারতোই না, পয়সার সাহায্যও তাদের কাছে নয়ন আশা করতে পারেনি।

বুদ্ধুর বউ-ই ছিল এ বস্তির মধ্যে নয়নতারার সকলের চেয়ে বড় শত্রু, আর সেই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সকলের চেয়ে বড় মিত্র। পৃথিবীতে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। নয়নতারাকে লছমনের বুকের উপর শুয়ে কাঁদতে দেখা অবধি বুদ্ধুর বউয়ের নারীর প্রাণ সহানুভূতিতে ঢলে পড়েছিল। স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তি চোখের জলে পথ বদলায়।

নয়নের মা সেই যে সেদিন ঝগড়া করে চলে গিয়েছে আর তার দেখা নেই। তার পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নয়ন একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লো। মা থাকলে হয়তো দু'টি ভাত নিয়ম ক'রে গালাগালির মধ্যেও নয়নতারাকে দিত। কিন্তু যখন মা'র দেখা নেই, তখন নয়ন বুঝলো, হয় উপবাসে তার প্রাণ যাবে, না হয় লছমনকে সে হারাবে।

এই বিপদে বুদ্ধুর বউ নয়নের উভয় দিক রাখলে। সে বুদ্ধুর বউকে মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগলো।

(২৮)

'কবে জ্ঞান ফিরবে?' নয়নতারা ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে।

ডাক্তার বাবু বললেন: আর বেশী দিন দেরি হবে না। আমার মনে হয় আর দু'একদিনেই ও কথা কইবে। দেখচো না, আজকাল নাম ধরে ডাকলে দু'এক ডাকের পর ও চোখ খোলে।

এমন দিন কি হবে ডাক্তারবাবু, যে ও কথা কবে? আমি ত সব আশা ছেড়ে দিয়েছি।

'কেন? আশা ছাড়বে কেন?' ডাক্তারবাবু প্রায় একটা ধমক দিয়ে বললেন। আরও বললেন, দেখচো না, এ যাত্রা ও যমের হাত থেকে ফিরে এলো। ওরতো বাঁচবার কোনই আশা ছিলনা; শুধু তোমারই যত্নে আর দিনরাত ধরে অক্লান্ত সেবায় ও বেঁচে উঠলো। শুধু তোমারই দয়ায়—

ওকথা বলবেন না ডাক্তার বাবু! আমি ওকে কি দয়া করবো? আমি কি একটা দয়া করবার উপযুক্ত লোক? আমি চটকলের একটা সামান্য কুলি মজুর্নী, গতরে খেটে নিজের পেট চালাই, আমি অপর মানুষকে কি দয়া কর্ব্বো?

ঐতো, ঐ'খানেই তো ভগবানের আশ্চর্য্য রকম কারিগরি। গরীবকে দয়া করে গরীব মানুষই, বুঝলে? বড় মানুষ নয়। যে নিজে দুঃখী, সেই পরের দুঃখ কি, বুঝতে পারে। এই যে এ লোকটা

মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কই এ বস্তির কোনও পয়সা-ওয়ালা লোক একে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করেছে? কিন্তু তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ করে একে বাঁচাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেচো। এইখানেই দুঃখী লোকের মহত্ত্ব, এইখানেই গরীব বড় লোকের চেয়ে বড় লোক।

নয়ন চুপ ক'রে ডাক্তার বাবুর কথা শুনতে লাগলো, কোনও উত্তর দিল না। একটু পরে ডাক্তারবাবু যাবার জন্য উঠলেন, নয়নতারা হাত দু'খানি জোড় ক'রে বললে: ডাক্তারবাবু, আপনার ফিস্ কিছু দিতে পাচ্ছিনে ব'লে কিছু মনে কর্বেন না। আমি আপনার সমস্ত ঋণ, গতরে খেটে চুকিয়ে দেবো।

—না বাছা, তোমায় আমার ফিস্ তো দিতে হবে না। কলের বড় সাহেব তার ভার নিয়েছেন। এই যে ওষুধপত্র আসচে, এর দামও তোমায় এক পয়সা দিতে হবে না। ও সব সাহেবের খরচ।

বড় সাহেব তো তাহ'লে খুব ভাল লোক? গরীবের ওপর তাহ'লে তো তাঁর খুব দয়া!

হবে না? না হ'লে তাঁকে যে বেশ বেগ পেতে হবে! শোনো নি, আজ কাল ট্রেড্ ইউনিয়ন ব'লে মজুরদের একটা রক্ষক-সমিতি ঠেলে উঠেছে।

'হাঁ শুনেছি।' নয়নতারা বললে:... হাঁ, তাঁরাই তো আমাকে চটকলের চাকরিটা যোগাড় করে দেন।

তবে ত তুমি তাদের জান। এরাই তো বড় সাহেবকে ব'লে লছমনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। নইলে আমি কি রোজ দু' বেলা আসতুম লছমনকে দেখতে, না পকেটে করে ওষুধ নিয়ে যোগাতুম?

তোমরা তো আমাকে ডাকতে যাও না, বা ডাক দিয়েও পাঠাও না! আর যে ক'দিন এসেছি, এর জন্যে ত তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও ফি বাবদ পাই নি। পেলেও আমি হাতে করে নিতুম না। এখন লছমনের অসুখের চিকিৎসার জন্যে দায়ী হয়েছেন কলের কর্ত্তারা। বুঝলে? কাজেই এজন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা জানলে কি ক'রে, যে লছমনকে কলের একজন সর্দ্দার মেরেছে?

ওদের তো কাজই হ'ল এই সব খবর খুঁজে বার করা। যাতে কুলি মজুররা সর্দ্দারদের হাতে অযথা উৎপীড়ন না পায়, এই উদ্দেশ্যটাই তো হ'ল ট্রেড ইউনিয়নের একটা মস্ত ভিত্তি মূল। সাহেবদের কাছ থেকে কুলি মজুরদের যতো অনিষ্ট হোক্ না হোক, সর্দ্দারদের কাছে যে হয় তার দ্বিগুণ। এটা জান তো?

জানি বই কি, খুব জানি। একেবারে হাড়ে হাড়ে ভুগেচি এর জন্যে আমি—আর এটা আমি জানি না? এই আমার ওপরেই তো সর্দ্দার কম অত্যাচার করেছে? তার তুলনায় আমাদের সাহেব তো দেবতা বল্লেও বেশী বলা হয় না।

তোমার ওপরেও সর্দ্দার অত্যাচার করেছিল না কি?

করেছিল ব'লে করেছিল। মেয়ে মানুষের পক্ষে যেটা শেষ অত্যাচার, সেইটাই আমার ওপর চালাবার চেষ্টা করেছিল।

ডাক্তারবাবু নয়নতারার মুখে একথা শুনে বললেন: হাঁ, হাঁ, এমনি একটা কি গুজব শুনেছিলুম বটে। তাহ'লে সেটা গুজব নয়, সত্যি?

একেবারে হুবহু সত্যি। আমিই তার শীকারের পশু।

তুমি এত বড় অত্যাচারের কথা ওপর-ওয়ালার কাণে তোলো নি কেন?

কবে তুলবো? সেই অবধিই তো আমি এই গোবেচারী লোকটিকে নিয়ে আটকে। এই লোকটিই তো আমাকে সেই লোচ্চা সর্দ্দারটার হাত থেকে বাঁচায়। নইলে আজ আমার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হোত!

নয়নতারা এ সব কথাগুলো ডাক্তারবাবুকে মুখ ফুটে বলতে প্রথমটা লজ্জা অনুভব কচ্ছিল, কিন্তু সেই নরপশু শিখ-সর্দ্দারটার ওপর মনে মনে তার এত রাগ ছিল যে তার তোড়ে লজ্জা একেবারেই ভেসে গেল। নয়ন শেষে বললে: লছমন যে দিন ভাল হয়ে গিয়ে পথ্য পাবে, আমি সেই দিনই যাবো সাহেবের কাছে সর্দ্দারের নামে নালিশ করতে।

ডাক্তারবাবু বললেন: তাই যেও। নইলে সোজাসুজি তোমার মুখে সব কথা না শুনে সাহেব সর্দ্দারকে কোনও শাস্তি দিতে পাচ্চেন না। অথচ ওদিকে ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা মহা খাপ্পা হয়ে দাঁড়িয়েচে।

আমার রুগীটিকে আপনি শীগগির তুলে দেন। আমি নিশ্চয়ই সাহেবের কাছে গিয়ে সব কথা বলবো।

তোমার রুগী ভাল হয়ে গেল বলে। কাল পরশুই বোধ হয় ও কথা কইতে পারবে!

আপনার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক ডাক্তারবাবু! আপনাকে আর কি বলে সন্তুষ্ট করবো!

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। নয়ন সানন্দ চিত্তে রুগীর শুশ্রূষা চালাতে লাগলো।

(২৯)

সকাল হতে না হতে লছমন হঠাৎ চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

নয়ন জিজ্ঞাসা করলো : কি দেখচো ?

লছমন ক্ষীণ স্বরে বললে : আমি কোথায় ?

নয়ন মুখখানা লছমনের মুখের কাছে এনে বললে : তুমি তোমার ঘরে আছ !

লছমন দু' বার চোখ পিট্ পিট্ করে আবার জিজ্ঞাসা করলো : তুমি কে ?

—আমি নয়ন।

—নয়ন ! তুমি আমার তদ্বির করচ ?

লছমনকে এত কথা এক সঙ্গে বলতে শুনে নয়ন যেন এক বহু-দিনের হারাণো রত্ন খুঁজে পেল। আনন্দে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পাচ্ছিল না। লছমনের চিবুকটি ধরে আদর করে বললে : হাঁ, আমিই তোমায় দেখচি শুনচি।

লছমনের কালো মুখখানা তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খানিক-ক্ষণ চুপ করে থেকে, একটা ঢোক গিলে লছমন পুনরায় মুখ খুললো। বললে : নয়না ? কাল রাতমে হামি একটা স্বপন দেখেচি।

নয়ন সাগ্রহে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো : কি স্বপন লছমন ?

লছমন সসঙ্কোচে উত্তর দিল : বলবো ? তুমি রাগ করবে না বলো !

রাগ কর্ব্বো ? না—রাগ কর্ব্বো কেন ?

হামি কাল স্বপন দেখেচি, তুমি আর হামি এক নতুন দেশে গেছি। সেখেনে আর কোই নেহি,—শুধু তুমি আর হামি। সে দেশমে বহুত রূপেয়া ! রাস্তামে রূপিয়া গড়াগড়ি যাতা হায়। কই লেনে আদমি নেহি হায়। তুমি তা দেখে হামায় সেন বললে : লছমন ? রূপিয়া সব কুড়ায় লেও। চলো হামলোক সব রূপিয়া কুড়ায়কে দেশমে চলা যাই। হামি বললুম : হামার রূপিয়ামে দরকার নেহি, হামি তোমাকে চাই।

লছমনের স্বপ্নের কাহিনী শুনে নয়নতারা কিছুমাত্র বিস্মিত বা চঞ্চল হ'ল না। সে বললে : এ স্বপ্ন তো তুমি অনেকদিন অনেকবার দেখেছ লছমন ?

লছমন উত্তরে বললে : তা হোতে পারে, কিন্তু আজ দেখে হামি বড় বে-একতার হয়েছি। নয়না ? আজ তোমায় জবাব দিতে হবে, তুমি সত্যি সত্যি হামার হবে কি না ?

নয়ন আপনাকে সামলে নিয়ে বললে : আচ্ছা ও কথার জবাব অন্য সময় হবে। এখন তুমি একটু দুধসাবু খেয়ে নাও দেখি।

লছমন মুখ ফিরিয়ে বললে : একথার জবাব না পেলে হামি আর কুচ্ছু খাব না।

নয়ন লছমনের চিবুকটি ধরে বললে : ছিঃ ! অমন রাগারাগি কি করতে আছে ? আগে পথ্যিটুকু খেয়ে নাও, তারপর জবাব শুনো।

লছমন বললে : মাইরি নয়না! তোর দিব্বি হামি যতক্ষণ না তোর মুখে শুনবো তুই হামাকে নিয়ে ঘর করবি, ততক্ষণ হামি দাঁতে কুটা করবো না।

নয়ন মনে মনে একটু হাঁসলো। সে যা উত্তর দেবে, সেটা এত শীঘ্র সে দিতে চায় না। জিবে লজ্জা যেন জড়িয়ে ধরে! সে বললে : আগে তুমি ভাল হয়ে ওঠো, তারপর ও সব কথা হবে।

লছমন বললে : হামি যতক্ষণ না তোমার মুখ থেকে জবাব শুনবো, ততক্ষণ ভাল হ'ব না।

—এখন তো গায়ে অনেকটা জোর পেয়েছ?

—জোর হামার দরকার নেই। তুমি আগে বলো, হামার হবে কি না, নইলে হামি আবার মারামারি করে মাথা ফাটাবো।

—এবার কার মাথা ফাটাবে? আমার?

লছমন উত্তর দেয় না। সে রাগ করে এক পাশ ফিরে শুয়ে রইলো।

নয়ন কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বললে : কাল বড় সাহেব নিজে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, জান তো?

লছমন উত্তর দিলে না।

তবু নয়ন বলতে লাগলো : বড় সাহেব তোমার মারামারির কথা জিজ্ঞেসা করলে, আমি সব খুলে বললুম। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, লছমনকে সর্দ্দার মারলে কেন? আমি বললুম, আমাকে সে ছাড়িয়ে নিতে গিছলো বলে'। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে : সর্দ্দার কি তোমাকে বে-ইজ্জত করেছিল? আমি তখন সব কথা খুলে বললুম। সাহেব শুনে ভারি চটে গেল, আর বললে সর্দ্দারকে কল

থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবে। আর তোমাকে একটা বড় রকম বথশিষ করবে।

লছমন আর রাগ করে থাকতে পারলো না। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ কি বকশিব কর্ব্বে বললে ?

—তুমি আগে পথ্যিটুকু খাও, তবে বলবো।

লছমন আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে অভিমানে। তার লজ্জাও একটু করতে লাগলো অভিমানের কথা ভুলে গিয়েছিল ব'লে। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলো না। আবার মুখ নয়নের দিকে ফিরিয়ে বললে ঃ বথশিষ যদি সাহেব দেয়, দেওয়া উচিত তোমাকে, হামাকে নয়।

—কেন ?

—কেন কি ? তুমি যে হামায় এই দিন রাত ধরে তদ্বির ক'রে ভাল করলে,—এ কে করে ?

—কে না করে ? বাড়ীর পাশে যে থাকে, সেই করে। চোখের সুমুখে একটা লোক মরচে, একি দেখতে পারা যায় ?

—বাড়ীর পাশে তো অনেক লোক আছে, কেউ তো করলে না ?

—করলে না,—কিন্তু করা উচিত ছিল।

—না নয়না ! হামি বেশ বুঝতে পেরেছি তুমি শুধু সে জন্তে হামাকে এতো খেটে খুটে বাঁচিয়ে তোলনি—তুমি হামাকে সত্যিই ভালবাসো ! না নয়না ?

—হাঁ, তাই তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইচিনে।

লছমনের মুখখানা কাল-বৈশাখীর মেঘের মত কালো হয়ে উঠলো।

সে তখনই পাশ ফিরে শুয়ে বললে : হামি কালই দরিয়ার জলে ডুবে মরবো।

নয়ন ফিক্ করে হেঁসে বললে : সাহেব যে তোমার দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেল !

লছমন উদাসীন ভাবে বললে : দিক্ গে !

(৩১)

নয়নতারা মুখ ফুটে কিছু বললে না, লছমনও তার কাছ থেকে কোনও উত্তর বার করতে পারলে না, তবু কিছুদিন বাদে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এতদিনে লছমন অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে। মাথা ফাটার জন্যে সে চটকলের সাহেবের কাছে বখশিব পেয়েছে; দশ টাকা ক'রে বেশী মাহিনে। নয়নতারা তার চাকরি ফিরে পেলে, কিন্তু সাহেবের অনুগ্রহে এখন আর তাকে বেশী খাটতে হয় না। সেই শিখ সর্দার চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গেল, এবং আদালতের বিচারে তার জেল হ'ল তিন মাস।

লছমন এখন বড় আনন্দে দিন কাটায়। নয়নতারা তার ছোট সংসারের সব ব্যবস্থা করে দেয়, কাজেই তাকে আর কোনও দিকে দেখতে হয় না। বেলা বারোটার সময় কল থেকে তেতে পুড়ে এসে তাকে আর আটা নিয়ে বসতে হয় না, নিজেকে রুটি বেলতে হয় না, উনুন জেলে রুটি সেঁকতেও হয় না। আজকাল তৈরি রুটি আবার

ড়হর ডাল তার জন্যে তৈরী হয়ে থাকে। এত সুখ লছমনের জীবনে এই প্রথম হল! তা ছাড়া তার অনেক দিনের সুখস্বপ্ন যে আজ সত্যে পরিণত হয়েছে, এইতেই সে আহ্লাদে আটখানা।

নয়নতারা চাকরীও করে, গিন্নীপনাও করে। বিয়ের দিন রাত্রে লছমন কিছু বেজায় রকম সরঞ্জাম করে ফেলে, তাই তাদের কিছু ঋণ হয়। সেই ঋণটা শোধ কর্ব্বার জন্যে নয়ন উঠে পড়ে লাগলো, নানা দিকে সংসারের খরচ কমাতে।

বিয়ের দিন রাত্রে লছমন বস্তির সকলকেই নেমন্তন্ন করে আসে। তা ছাড়া কলেরও অনেক মজুর-মিস্ত্রিকে, এমন কি সাহেবদের পর্য্যন্ত সে এই বিরাট উৎসবে যোগদান কর্ত্তে অনুরোধ করে আসে। বস্তির লোক অবশ্য সকলে আসে নাই, তবু যারা এসেছিল তারা সংখ্যায় বড় কম নয়। বাঙ্গালী মিস্ত্রি গৃহস্থেরা কেউ আসে নি, কেননা, তারা এই ভিন্ন জাতীয় বিবাহ পছন্দ করলো না। গোঁড়া হিন্দুস্থানীরাও অনেকে এল না, কেননা, তারা বাঙ্গালীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধটাকে ধর্ম্ম-নিষ্ঠার বিপরীত আকৃতিতে দেখে। তারা পেটের জন্য কলে চাকরি করে, চুরি-চামারি পর্য্যন্ত কর্ত্তে রাজি আছে, অধীনস্থ মজুরদের হকের পয়সা মেরে দেশে তিন গুণ টাকা পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তা বলে বাঙ্গালীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর বিয়েতে কি করে পাত পেড়ে খেয়ে যেতে পারে? তাতে যে তাদের পরকালের পথে কাঁটা পড়বে! তাদের পরমাত্মা যে চটে যাবেন!

মাদ্রাজী অনেকে এল, কেউ কেউ এলো না। উড়ে দু' একজন এলো, শুধু মাছ মাংস তরকারি খেল না, আর সব খে'ল। ঐ কটা

জিনিষ খেলেই নাকি তা'দের জাত যায়! অন্য কিছুতে জাতের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। তারা এগুলোকে বলে এঁটো। এঁটো আর জাতে অপাংক্তেয় সম্পর্ক।

কলের মজুররা অনেকে এলো, পেট ভরে খেলে, আবার যাবার সময় দু এক আনা বউএর মুখ-দেখানি দিয়ে আনন্দ ক'রে গেল।

বুদ্ধুর বউ এসে মাথায় কুলো বয়ে জল বয়ে গেল, আলপনা দিয়ে গেল, নয়নকে গয়না পরিয়ে দিয়ে গেল, বিয়ের সময় কনে বরণ করলে। সবই করলে, কেবল খাবার সময় পালিয়ে বাসায় গিয়ে ঘরের খিল বন্ধ করে দিল। অনেক ডাকাডাকিতেও জবাব দিলে না। তার পর সাত দিন আর বুদ্ধুর বউ এ বাড়ীতে আসে নি।

বুদ্ধু হয়েছিল বরকর্তা, কাজেই একজোড়া ধুতি উড়ুনি রোজগার করলে।

যাহ'ক, অনেক গোলমাল হলেও লছমনের বিয়ে বেশ সুসম্পন্নই হয়ে গেল। যারা এসেছিল তারা খেয়ে বেশ প্রশংসাই করে গেল। এই প্রশংসা অর্জ্জন করতে লছমনের অবশ্য কিছু ধার হোল।

ধার হোত না, যদি না নয়নতারা একটা বায়না ধরতো। লছমন ঠিক করেছিল, সকলকে চিঁড়ে দই আর লাড্ডু খাইয়ে দেবে। নয়ন শুনে বললে: তা হোত, যদি তুমি পশ্চিমে খোট্টার দেশে বিয়ে করতে। এ বাঙ্গলাদেশ, এখানে বিয়েতে লুচি খাওয়াতে হয়। লুচি মেঠাই যদি না করো তাহলে আমি বাড়ী থেকে চলে যাব।

এত বড়ো অভিশাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে লছমন নিজের মত বদলালো। বিশেষ, এসময়ে নয়নতারার কথা

ঠেলবার তার শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। বুদ্ধুর কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার করে মুদির দোকানে দিয়ে এল। এই বোকামিটা তাকে করতে হয়েছিল নয়নতারার খাতিরে।

বিয়ের দিন সকালে নয়ন একটু কাঁদলো তার মায়ের জন্যে! অনেক দিনের মা'কে একদিনের আমোদে ভোলা যায়না, বিশেষ আমোদের এমন একটা বদনাম আছে, সে তার পদক্ষেপ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা পুরাতন জীর্ণ বিষাদকে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার নতুন ক'রে তোলে।

লছমনের দেওয়া রূপোর গয়নাটা হাতে পরতেই নয়নতারার মনে এলো মায়ের কথা। তার মা কতোবার বলেছিল, একখানা যাহোক-তাহোক গয়না তোর হাতে পরিয়ে দিতে পারলে দেখতে বড় চমৎকার হয়। কিন্তু এ সদিচ্ছা মা কখনও পূরণ করতে পারেনি। মা যে সাধ মিটাতে পারেনি, আজ লছমন আমার সে সাধ মেটালে। আজ মা যদি কাছে থাকতো, নিশ্চয়ই আমার গায়ে গয়না দেখে তার সব রাগ ভুলে যেতো। আমার চিবুক ধরে একবার একটা চুমু খেতো। কিন্তু মা'র কপালে সে সুখ নেই,...আমারও কপালে,—আর নয়নতারা থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। লছমন দেখে আশ্চর্য্য বোধ করতে লাগলো, কিন্তু মেয়ে মানুষের মনের ভেতর ঢোকবার তখনও তার শক্তি হয় নি। কাজেই সে এমন সুখের দিনে দুঃখের চোখের জল দেখে বড় মন-মরা হয়ে গেল।

নয়নের চোখের জল আপনার কোঁচার খুঁটে মুছিয়ে দিয়ে লছমন জিজ্ঞাসা করলে : নয়ন, অমন করে কাঁদতে বসলে কেন ভাই ?

নয়ন বললে : মা'র জন্যে বড় মন কেমন কচ্চে।

লছমন বললে : মা'কেতো আমরা কোন অচ্ছেদ্দা করিনি, তিনিতো নিজেই নিজ হ'তে চলে গেলেন : তা আমরা কি কর্ব্বো ? আর আমিতো তখন একেবারেই বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিলুম।

নয়ন কান্নার গোটা-গলায় বলতে লাগলো : না, তোমার তাতে দোষ কি ? দোষ সবই আমার কপালের। নইলে, তোমাকেই বা মা দেখতে পার্ব্বে না কেন ? তোমার ওপর গোড়া থেকেই মা'র যেন কেমন কোপদৃষ্টি ছিল।

লছমন দুঃখিতভাবে বললে : কিন্তু আমি কি দোষ করেছি তাঁর পায়ে, বলতো নয়ন ?

নয়ন উত্তর করলে : না, মা'র বোঝবার ভুল। নইলে তুমি যা উপকার করতে আমাদের, তেমন উপকার ক'টা লোক করতো ? কই, এইতো বাবার ভাই রয়েছেন দেশেতে, তিনি কি বাবার অসুখের সময়ে একবার উঁকি মেরেছেন !

নয়নের কথা শুনে লছমনের মনের মেঘগুলো অনেকটা ফর্সা হয়ে গেল। সে নয়নের বাম হাতখানা আপনার হাতের উপর তুলে নিয়ে বললে : আমার একটা দুঃখু রয়ে গেল নয়ন, যে আমি মাকে কখনও খুসী করতে পারলুম না।

নয়ন একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, মা'র ওই কেমন একটা দোষ ছিল। বাঙ্গালী ব'লে হিন্দুস্থানীদের মোটে দেখতে পারতেন না। কেন ? হিন্দুস্থানীরা কি মানুষ নয় ?

লছমন এবার অনেকটা সাহস পেয়ে বললে : সেকথা যদি তোমরা

বলো, তাহ'লে আমরাও তো তোমাদের ঘেন্না করতে পারি। বাঙ্গালী নাহয় বাঙ্গলা দেশেই বড় হ'ল, কিন্তু আমাদেরও তো দেশ আছে। সেখানে আমরাও তো তোমাদের ওপর ঝাল ঝাড়তে পারি।

লছমনের যুক্তি শুনে নয়নও আরম্ভ করলো: আমরা ছেলেবেলা থেকে এমন সব অন্যায় ধারণা পাই যে সেগুলোর কোনও মানে হয় না। হিন্দুস্থানী দেখলেই তাকে ঘেন্না করবো, সে যতই সুন্দর হোক না কেন! দামী দামী ফর্সা পোষাক পরা থাকলেও, তাকে ভাববো ছোট লোকের ছেলে বলে! এই বা কেমন কথা? এরকম অন্যায় কাণ্ড এদেশে আর চলতে পারে না। বাঙ্গালীর যখন পয়সা ছিল, তখন হিন্দুস্থানীদের ঘেন্না করা হয়তো চলতো! কিন্তু আজ বেশীর ভাগ বাঙ্গালীকে খেটে খেতে হয় চট্‌কলে, কারখানায়, মিস্ত্রিখানায়। এসব যায়গায় বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী পাশাপাশি কাজ করে। পাশাপাশি কাজ করলে একজন আর একজনকে ঘেন্না কর্ব্বে কেমন করে? এ দু'দলে এখন মিল হয়ে যাওয়া উচিত।

লছমন নয়নতারার বেশ সেয়ানার মত কথা শুনে বড় তারিফ করলে। ভারি খুসি হয়ে বললে: নয়ন? তুই যদি ভাই লেখাপড়া শিখতিস্ তাহলে ভারি বড়া আদ্‌মি হতে পারতিস্। তুই ঠিক বলেছিস এ দুইদলে মিল হয়ে যাওঁয়া দরকার, নইলে বড়া খারাপি হবে। বাঙ্গালী যেখন জমিদার আমীর ওমরা ছিল, তেখন হিন্দুস্থানী আদমিকো মেড়ো খোট্টা এসব বোল্‌কে হেনাস্থা করা চলতো। এখনত ভাই চাকা উলট্টে গেছে। এখন হাম্‌বি মজুর, বাঙ্গালীবি মজুর। এখন হাম্‌বি চটকলমে কাম করতা, তোম্‌বি চটকলমে কাম করতা। তব্ ফারাক কাঁহা ভাই?

লছমন এতক্ষণ বেশ বাঙ্গলাভাষায় কথা কচ্ছিল, কিন্তু যখন তার মনটা জাতীয়তার উত্তেজনায় জেগে উঠলো, তখন তার ভাষাও হয়ে দাঁড়ালো জাতীয়তার কাণমলা খেয়ে তারই অনুমোদিত ধরণে। মনে যখন তুফান ওঠে, মানুষ তখন রোজগারি ভাষা ভুলে যায়, মাতৃস্তন্য থেকে যে ভাষা তার রক্তে মিশে আছে, সেই ভাষাই তার জিবে আগে এসে পড়ে। মনের তুফান কণ্ঠের বালুতটে আছড়ে এসে পড়ে।

নয়নতারা বসে কি ভাবছিল। লছমনের কথা শেষ হ'লে বললে: ফারাক যার কাছে আছে তার কাছে থাক্‌গে, আমাদের কাছে নেই। বড়লোকদের জাতবিচার শানা চলে, আমাদের চলে না! পেটের জন্যে যাদের খাটতে খাটতে দম ফেটে যায়, তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের ফারাক টানবার সুবিধে পাবে কোথা থেকে? মা এই কথাটা বুঝলে না এইটেই বড় আপশোষ!

লছমন শেষে বললো: আরে মার কথা ছোড় দেও! মা পুরাণা আদমি, ওতো হিন্দুস্থানী লোককো তফাত্‌ জরুর করেগা। তুমি যে মায়ের সঙ্গে ভিড়ে হামাকে বরখাস্‌ করোনি, এই হামার নসীব।

ঠিক এমনি সময় বুদ্ধুর বউ ঘরে ঢুকে বললে: আরে তোমলোক বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে বাত্‌ করতা হ্যায়, ইধার যোগাড় ক্যাইসে হোগা?

মস্ত একটা সামাজিক সমস্যার তর্ক এইখানেই শেষ হ'ল।

(৩১)

গ্রামটির নাম ছিল দো-গাছি।

অবশ্য যাঁরা মনে করেন, ঠিক দু'টি মাত্র গাছ ছিল ব'লে এ গ্রামের এমন নামকরণ হয়েছে, তাঁরা মস্ত ভুল করেন। কেননা, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, গ্রামখানি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বছরের মধ্যে প্রায় আট মাস, দোগাছি গাছ-গুল্ম-লতা ইত্যাদিতে একেবারে সমাবৃত হয়ে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত বুড়োর মত লেপ মুড়ি দিয়ে আপনার গণ্ডা আপনি বুঝতে থাকে, বাকি শীতকালের কয় মাস লেপের ভেতর থেকে মুখ বা'র ক'রে কোনও রকমে সাড়া দেয় 'আমি আছি'।

বর্ষাকালে গ্রামের যা অবস্থা হয়, তাতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে তার সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বিতা একেবারেই লোপ পায়। গ্রামের বাইরে যত ধানের ক্ষেত আছে, সমস্তই গলা জলে দিনরাত চুবুনি খেতে থাকে। একবার যদি বা একটু মুখটা বাড়িয়ে বাহিরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পায়, পরক্ষণেই আবার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাদের মাথার ওপর দিয়ে জলের ঢেউ বিজয় দম্ভে অভিযান করতে থাকে।

অনেক মেঠো রাস্তা পার হয়ে, অনেক বোঁচগাছের ঝোপ পাশ কাটিয়ে, অনেক তেঁতুল গাছের রন্ধ্রহীন তলদেশ দিয়ে, সাপ-খোপের অত্যাচার থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে, তবে এই গ্রামে পঁহুছিতে হয় কোনও আগন্তুককে। রেলপথ থেকে অনেক দূরে এর সামানা। গরুর গাড়ীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-চূর্ণকারী যান-বাহনই এ গ্রামে পঁহুছিবার একমাত্র

নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত উপায়। তবে যাঁদের চরণ ধেনো-মাঠের এবড়ো-খেবড়ো জমিতে রক্তাক্ত হয়েও আপনার শক্তি হারায় না, তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম রেখে একথা বলতে হবে, তাঁরা সত্যই বীরাগ্রগণ্য এবং যদি বীরত্বের কোনও পুরস্কার এ পৃথিবী দিতে জানে, তাহ'লে তাঁরাই এ পুরস্কার পাবার প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি।

সাপ-খোপের ভয়ও এ রাস্তায় আছে, কিন্তু সে-সকলে ভয় পায় কা'রা? যারা সাপের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করে, তারা কি কখনও তাদের ভয় পায়? গ্রামবাসীরা এ সকল জন্তুকে মোটেই গ্রাহ্য করে না, কেননা তারা যে তাদের প্রতিবেশী। অনেকে তাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাতেও কসুর করেনি।

আষাঢ় মাসের প্রথমে মাঠ পথ কিছু কিছু জলে ডুবেছে, এমন একটা দিনে একটি প্রাপ্তবয়স্কা প্রৌঢ়া একটি ছোট মেয়ে কোলে ক'রে মাঠের পথ দিয়ে দোগাছি গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বৃষ্টি ঝির ঝির করে একটু একটু পড়ছিল, কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকটি বিশেষ কাতরা নয়। মাঝে মাঝে হাঁটুভোর জল ভেঙ্গে তাকে যে এগুতে হচ্ছিল, এর জন্যেও সে ভ্রূক্ষেপ কচ্ছিল না। পাশে মাঠের ওপর চাষারা মাথায় তালপাতার টোকা চড়িয়ে ধান বুনতে বুনতে যে তার দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখছিল, তাতেও রমণী কিছুমাত্র বিচলিত হচ্ছিল না। আপনার মনের গোঁয়ে আপনি সে চলছিল গ্রামের দিকে।

খানিক দূর এসে, পাশে একটা সাঁকো দেখতে পেয়ে রমণী তার কোলে-চড়া মেয়েটিকে বললে: একটু বস্ দেখি কাজলা, আমি একটু জিরিয়ে নি।

সাঁকোর দুই দিকে দুটো উঁচু রোয়াকের মত ছিল, সেগুলো বিলিতি মাটি দিয়ে বাঁধান। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দয়ায় বোধ হয় এই সাঁকোর রোয়াকগুলো জন্মলাভ করেছিল। যাহ্'ক, রমণীটি মেয়েটিকে সেইখানে জোর করে বসিয়ে দিয়ে আপনি একটু কোমর ছাড়িয়ে দাঁড়াল।

দাঁড়াল বটে, কিন্তু মুখ কামাই নেই। মুখে অনবরত ব'কে যাচ্ছিল সে! "মুখে আগুণ! মুখে আগুণ! অমন মেয়ের কি মুখ দেখতে আছে? আর পৃথিবীতে লোক খুঁজে পে'ল না, শেষকালে কি না একটা মেড়ো! তাই যদি একটা পয়সা-ওয়ালা মেড়ো হ'ত, তাহলেও যা হয় কথা! তা নয়, শেষকালে কি না একটা পাটকলের মজুর! প্যাংরা মারো মাথায়! আমি শত জন্ম আইবুড়ো হয়ে থাকি, সেও ভাল, তবু আমার অমন ভাতারে কাজ নেই। আর কি নিঘ্‌ঘিনে গো! জাতকুল সব মজালে! একবার ভেবেও দেখলো না যে তুই কোন্ বংশে জন্মেছিস্! ও যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে কি এমনটা হ'তে দিত! আমার কপালে এসব ভোগ লেখা আছে, তা না হলে সেই বা চলে যাবে কেন? ঘোর কলি! ঘোর কলি! মেয়েটা একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে না গা!"

ইত্যাদি অনেক রকম আপশোষ রমণীটি কর্ত্তে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পাশেই বড় একটা ধেনো মাঠ, তার ওপর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো চাষা ধানগাছ নেড়ে পুঁতছিল। গায়ের মাংস তার লোল হয়ে পড়েচে, তবু সে রবারের মত শরীরকে টেনে টেনে,

এই জলে দাঁড়িয়ে সম্বৎসরের পেটের জ্বালার ব্যবস্থা কচ্ছে। বুড়ো চাষা বোধ হয় প্রৌঢ়া রমণীটির চেঁচিয়ে-বলা চিন্তা-স্রোতটি শুনতে পেয়েছিল। সে শেষ কথাটির সূত্র ধরে বললেঃ কলি কি এসে গেছে না কি বাছা ?

প্রৌঢ়া, বুড়ো চাষার প্রশ্নে অপ্রস্তুত হ'ল না, বরং খুব প্রস্তুতের মতই উত্তর দিলেঃ তোমার এত বয়েস হয়েছে আর তুমি জান না কলি পৃথিবীতে এসে গেছে কি না!

বুড়ো বললেঃ আমার তো মনে হচ্চে, সে পাজি দেবতাটা এখনও পুরোদমে এসে পড়ে নি। তাই যদি আসবে, তাহ'লে এখনও চন্দর স্থয্যি উঠচে কেমন ক'রে ?

—চন্দর স্থয্যি যার কাছে উঠচে, তার কাছে উঠচে। আমার কাছে ত কই কেউ-ই ওঠে না! আমার যে রাত আরম্ভ হয়েচে তাতো আর শেষ হতে চায় না!

শেষ হবে, শেষ হবে। বিশ্বেস রাখো, একদিন শেষ হবে। আজ কষ্ট পেয়েচো তাই অমন বলচো! আবার যখন সুখের দিন আসবে তখন অন্য রকম বলবে!

না বাপু! আমার আর সে আশা নেই! আমার সব আশাই সেই হতভাগা মেয়েটা উপ্‌ড়ে ফেলেচে!

তোমার কি হয়েচে কি, আমরা একটু শুনতে পাইনে ?

সে শোনাবার মত কথা নয় গো! মানুষকে যে মানুষ জানাবে, এমন ফাঁকটুকু সে রাখে নি।

সে কে তোমার ?

কে আর আমার! যম আর কি!

যম? যমের ওপর তোমার এত অভিমান? কিন্তু তাকেতো একদিন তোমায় ধরা দিতে হবেই!

সত্যি। যমের কাছে ধরা দেওয়া ঢের ভাল, কিন্তু এ মানুষ-যমকেতো আমি পেরে উঠচি নে!

বুড়ো চাষা হাতের কাজ ফেলে প্রৌঢ়ার দিকে চোখ তুলে বললে: মানুষ-যম? তাহ'লে কোনও লোক বুঝি তোমার সর্ব্বনাশ করেচে, তার ওপর রাগ ক'রে এসব কথা বলচো?

হাঁ, লোক ব'লে লোক! একেবারে নিজের পেটের লোক! তাইতো, কিছু করে উঠতে পাচ্চিনে! কিছু করতে গেলে, নিজের পেটে টান পড়ে!

বুড়ো এতক্ষণে বুঝে বললে: ওঃ! নিজের পেটের ছেলে মেয়ে বুঝি কেউ বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে! দুঃখু করোনা গো দুঃখু করো না, ওটা সংসারের এক রকম বাঁধা নিয়ম। তা না হ'লে আমি এ-বয়সে কোদাল হাতে ক'রে বিষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠে ধান বুনি! বাপ মা হলেই ও শাস্তিটা সকলকেই ভুগতে হয়!

কিন্তু এ সান্ত্বনা কিছুমাত্র কাণে না তুলে প্রৌঢ়া আপন মনে বকে যেতে লাগলো: বাপতো পালিয়ে গেল ড্যাঙ্-ডেঙ্গিয়ে! এখন যত কিছু ভুগতে হচ্ছে আমাকে! মুখে আগুন, মুখে আগুন! দশমাস দশদিন পেটে ধরলুম, নিজে মুখের গেরাস বার ক'রে নিয়ে খাইয়ে মানুষ করলুম,—এখন সে মেয়ে চিনলে কিনা একটা মেড়োকে, যাকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে! যাক্‌গে! তার ছায়া আর আমি এ জীবনে

মাড়াবো না! চল্ রে কাজল, চলে চল্। দেখি, কোথায় আবার হাড় ক'খানা জুড়োবার ঠাঁই মেলে!

প্রৌঢ়া তার মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে সুরু করলো।

কোথায় যাবে তোমরা? বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে।

যাবো আর কোথায়? দেখি, কোথা জায়গা মেলে?

এখন যাচ্চ কোথায়?

ঐ দোগেছে গেরামে যাবো। হ্যাঁগা, সে আর কতদূর?

দোগেছে যাবে? কাদের বাড়ী গা?

ঐ পালেদের বাড়ী! চেনো ওদের?

দোগেছের পালেদের? চিনি বইকি! আমারও তো বাড়ী ঐ গেরামে।

বটে? তা ভাল। তা হ্যাঁগা, দোগেছের লোক গুলো কেমন ধারা গা?

বুড়ো গোটাকত ধান গাছ জল-কাদায় পুঁততে পুঁততে বললে: কেমন ধারা আর? যেমন পাঁচজনে, তেমনি! মানুষও আছে, আবার জানোয়ারও আছে।

বলি, আত্ম-কুটুম্বুকে দয়া ধম্ম করে? না, কেবল নিজেদের পেটটাই চেনে?

কেন, এমন কথা জিজ্ঞেসা কচ্চ কেন?

প্রৌঢ়া সামলে নিয়ে বললে: না, তাই বলচি!

বুড়ো সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে: তুমি পালেদের কোনও কুটুম্বু-টুটুম্বু হও বুঝি?

প্রৌঢ়া যেতে যেতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে : হাঁ, বাঁধন একটা আছে বৈ কি! তবে তাঁরা এখন স্বীকার করলে হয়!

কি রকম সম্বন্ধ?

তা খুব নিকট। আমি তাদের বাড়ীর বঁউ। ...বলতে বলতে রমণী মাথার কাপড়খানায় একটু টান দিলো।

বউ হও? কোথা থেকে আসচো তুমি?

আসচি অনেক দূর থেকে গো! সে তোমরা চিনবে না। সোয়ামী কাজ করতেন কাঁকনাড়ার পাটের কলে।

পাটের কলে? ...বলে বুড়ো চাষা একবার ভেবে নিলে। বেশীক্ষণ লাগলো না তার আন্দাজ করে নিতে। বুড়ো অনেক দিনের লোক, তার স্মৃতির ভাড়ার জিনিষ-পত্রে একেবারে থৈ-থৈ করতো! সে চট্ করে বললে : ও বুঝিচি! আমাদের কালির বউ তুমি? কালিই তো কাঁকনাড়ার চটকলে মিস্ত্রিগিরি করতো।

পরিচয়টা একেবারে হাতে-হাতে হয়ে গেল দেখে কালিমিস্ত্রির বউ হেমাঙ্গিনী একটু সঙ্কুচিত হলো। মাথার কাপড়খানা আর একটু টেনেও দিল সে। শ্বশুরবাড়ীর লোক, একটু সম্ভ্রম তো করতে হয়! চাষা হ'লে কি হয়? তার শ্বশুর বাড়ীর গেরামে জজ-ম্যাজিষ্টর আর ক'টা আছে?

—কালির বউ? তা এতক্ষণ বলতে হয়! আমি বলি, কে না কে? ...হাঁ, হাঁ শুনিচি বটে, কালি মারা গেছে! তা দেশে তো ঘরকন্না করলে না, চিরকাল বাইরে বাইরেই কাটালে! কাজেই তোমাকে আর চিনবো কি করে বলো? তা, কালি কিছু রেখে-টেখে গেল?

হেমাঙ্গিনী একটু খাটো-গলায় বললে : পোড়া কপাল ! একটা কাণা কড়িও নয় ! তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব পথে বসেচি !

বুড়ো আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে : বটে ! তা এতো রোজগার করতো, তুমি দুটো সরিয়ে রাখতে পারো নি ?

হেমাঙ্গিনী কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে : তখন কি জানতুম যে এমনটা ঘটবে !

বুড়ো কপালের ওপর ভুরু তুলে বললে : ওমা ! এর জানা-জানি কি ? তুমি এতো বড্-ডা হ'লে, আর এটা জনো না যে, মানুষ কেউই এখেনে চিরকাল থাকতে আসে নি।

তখন ভাবতুম অন্যরকম ! সেইটে-ই তো আমার বোকামি !

এঃ ! বড় ভাল কাজ করোনি বাছা, ভাল কাজ করো নি ! এত বড় ভুলটাও করতে আছে ! তা যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন দেখো যদি ভাসুর দেওর তোমায় যত্ন-আয়ত্তি করে !

সে আশাতেই তো সেখেনে যাচ্ছি।

যাচ্ছ বটে, তবে সুবিধে যে খুব হবে, তা বলে মনে হয় ন যাক্ গে, ও সব কথায় আমার দরকার কি বাছা ? তোমাদের ঘরোয়া কথায় আমার কি পিয়োজন বলো ?

আমি একটু একটু জানি। তবু একবার দেখি, যদি অসময়ে মুখ তুলে চায়।

তোমার ছেলে-পুলে কি বাছা ?

দু'টি মেয়ে, তার একটি তো,—

একটি কি হয়েছে ?

হবে আর কি! এমন কিছু নয়। তবে, সেটি আমার বাধ্য নয়।

বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি? আর যেটি কোলে, ঐটিই তোমার ঘাড়ে পড়েচে?

ঘাড়ে আছেন দু'টি-ই! তবে,—

বুড়ো কৌতুহল-পরবশ হয়ে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলো: তবে কি বলছিলে? ...সে মেয়েটি বিধবা হয়ে আছে বুঝি?

বিধবাও নয় গো, সধবাও নয়।...সে অনেক কথা! সে আর তোমাকে কত শোনাবো?

বিধবাও নয়, সধবাও নয়! তবে? ওঃ বুঝিচি, বড় হয়েছে, তবু এখনও বিয়ে দিতে পারো নি!

নাঃ। বিয়ে তার দিতে পারলুম কই? বিয়ে দিতে পারলে কি আর এই যন্ত্রনা আমায় ভুগতে হয়!

বড় যন্ত্রনা, বাছা, বড় যন্ত্রনা! মেয়ে বড় হলে আর যে যন্ত্রনা, তা যেন অতি বড় শত্রুতেও না পায়!

হেমাঙ্গিনী এ কথায় আর কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললো মাত্র। পরে কাজলকে কোলে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলতে লাগলো।

বুড়ো একবার চেঁচিয়ে বললে: রাস্তা চিনে যেতে পারবে ত কালির বউ?

হেমাঙ্গিনী আর পেছন না ফিরে বললে: তা পার্ব্ব-খন। অনেকবার ত এসেছি। এ পথ আর ভুলবো কেমন ক'রে?

বুড়ো আর একবার চেঁচিয়ে বললে : হাঁ, তাতো বটেই ! গেরামের বউ, শ্বশুরবাড়ী চিনতে পার্ব্বে না ? ঐ যে ঐ মুদির দোকান দেখা যাচ্ছে ! ঐ দোকানের ডানদিক দিয়ে রাস্তা। আর একটু গেলেই পাবে পালেদের বাড়ী।

(৩২)

মেঠো পথটা আর একটু এগিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। একটা গেছে ডাহিনে দোগেছে গ্রামের ভেতর, আর একটা গেছে বামে আর এক গ্রামে। ঠিক মোড়ে, পথটা ভাগ হবার ঠিক সম্মুখে আছে একখানা মুদীর দোকান। দূর থেকে দোকানখানা দেখতেই হেমাঙ্গিনীর সব মনে পড়ে গেল।

বিয়ে হবার পর যখন সে প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসে, তখন ওই দোকানটার সম্মুখে তার পালকি দাঁড়িয়েছিল আধ ঘণ্টার ওপর। সে আজ অনেক দিনের কথা! কিন্তু তার মনে এখনও সে কথা জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছে। এই দোকানদারের বাড়ীর মেয়েরা বউ দেখতে এসে প্রথম তাকে শোনায় "ও মা, বউ তো নয়, যেন ছেলে পুলের মা! এত বড় মেয়ে কি কেউ কখনও আইবুড়ো রাখে! হেমাঙ্গিনীর তখন বয়স এগারো বছর মাত্র! তবু তাকে কথা শুনতে হয়েছিল, শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের লোকের কাছে! শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাও তাকে দিনরাত খোঁটা দিত, ধিঙ্গি মেয়ে ব'লে। আর আজ তার নিজের মেয়ের

বিয়ে হয়নি, আঠারো উনিশ বছরেও! হেমাঙ্গিনীর মনে ছাঁৎ ক'রে এ বৈষম্যটা ঠেলে উঠলো।

হেমাঙ্গিনী দূর থেকে দেখলে, মুদিখানা দোকানের স্মুমুখে কে একজন লোক একটা মোড়ার উপর বসে তেল মাখছে। সে অনুমান করে নিল, এই গ্রামেরই কোনো মাতব্বর লোক হবে। লোকটির বেশ বড় একটি ভুঁড়ি আছে, আর দেহটিও বেশ জাঁকাল রকমের। মাথায় পাকাচুল; স্মুমুখে একটু ছোট-খাট টাকও আছে। লোকটিকে চেনো চেনো বলেও তার ঠেকলো। কিন্তু পুরুষ মানুষের দিকে ভাল ক'রে তাকান তো যায় না!

তার এলো একটু সমীহ। শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের বুড়ো লোক; মাতব্বর টাতব্বর নিশ্চয়ই হবে। কাজেই একটু ঘোমটা না টেনে দিলে হিতে বিপরীত হবে যে!

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে, হন্ হন্ করে মোড়টা পার হবার চেষ্টা করলো।

যেতে যেতে কাণে গেল, দোকানদার বলচে ঃ ওকি কচ্চেন কত্তা? একেবারে যে আধসেরটাক তেল আমার সাবাড় করলেন?

লোকটি ধমক দিয়ে বলচে ঃ যা, যা, সন্তা, তুই বড় বাড়িয়েছিস দেখচি! ভারিত একটু তেল মেখেচি, তার জন্যে কথা শুনোচ্চে! তোর দোকানে রোজ কত জিনিষ নি, আর একটু তেল অমনি মাখতে দিবি নে?

এ জবাবে দোকানদারকে একটু নরম হতে হ'ল। তবু সে বললে, মাখুন না একটু আধটু। তা ব'লে ঐ অতো? ওরকম করলে যে আমি হুদিনে ফেল হ'ব?

—হ্যাঁঃ! ফেল হবি! আমি মাখলেই তুই ফেল হবি! আর ঐ যে নেত্য, হরিযুগী, উমোচরণ সকলে তেল মেখে গেল, তাদের বেলায় কিছু হয় না?...হাঁরে সন্তা? ঐ মাগীটা কে গেল, তুই চিনিস রে?

সন্তা অর্থাৎ সনাতন মুদি উত্তর দিল: কে কোথায় রাস্তা দিয়ে গেল, আমি চিনবো কি করে?

বাঃ! মাগী দেখতে ত মন্দ নয়! বেশ আঁটো-সাঁটো হিষ্টু পুষ্টু গড়ন ত! ওঃ! আবার ঠমকে ঠমকে চলচে দেখ না!

সনাতন একটু রেগে বললে: ও আপনার কি রকম স্বভাব? রাস্তা দিয়ে মেয়েছেলে গেলেই তার দিকে নজর দেন?

নজর দেবো কেন? তাই দেখচি। মাগীত এ গেরামের বউ নয়! বাইরের কোন দেশ থেকে আসচে!

সনাতন নিস্পৃহ ভাবে বললে: তা হবে, কার বাড়ীতে বোধ হয় কুটুম এলো।

লোকটি অনুসন্ধিৎসু হয়ে বললে: কার বাড়ীতে বল্ দেখি?

সনাতন একটু উঁকি মেরে দেখে বললে: আপনার বাড়ীর দিকেই ত যাচ্চে। দেখুন যদি জালে কাতলা মাছ পড়ে।

'আমার বাড়ী?' বলেই লোকটি বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি দোকানের টাটের ওপর বসান তেলের ভাঁড় থেকে খানিকটা তেল পলা করে হাতে ঢেলে নিয়ে, তাই মাখতে মাখতে বাড়ী পানে রওনা হ'ল। দোকানদার অবিশ্যি হাঁ হাঁ করে এসে দু'চার কথা ছুঁড়ে মারলে, কিন্তু তাতে লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না। সে তেলের সদ্ব্যবহার করতে করতে পা চালিয়ে চললো।

(৩৩)

দোকানদার ও ঐ ভুঁড়িদার লোকটিতে যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, হেমাঙ্গিনী পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার অধিকাংশই শুনতে পেলে। যখন লোকটি তাকে উদ্দেশ ক'রে তার গড়ন-পিটনের তারিফ কচ্ছিল, তখন হেমাঙ্গিনী বুঝতে পেরে একেবারে লজ্জায় মরে গেল। কে এমন লোক এ গ্রামে আছে, যে হেমাঙ্গিনীর মত বিগত-যৌবনা স্ত্রীলোককেও লালসার চক্ষে দেখে, তা জানবার জন্য তার বড় কৌতূহল হ'ল। সে একবার চট্ করে পেছন ফিরে তার আধটানা ঘোমটার ভিতর দিয়ে দেখলো, লোকটা কে?

চোখ পড়বামাত্রই হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলো তাকে দেখে। এ যে পরিচিত! শুধু পরিচিত নয়, এযে একেবারেই অন্তরঙ্গ! এঁর বাড়ীতেই ত হেমাঙ্গিনী যাচ্চে! এযে ভাসুর! ওমা কি লজ্জা!

ভাসুর তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেননি। পারলে এমন ধারা লম্পটের মত তিনি কখনই মন্তব্য প্রকাশ করতেন না। কি লজ্জার কথা! তাকে দেখে বুড়োর এই বয়সে এই ভাব! চিনতে না পারলেও, অপর মেয়েমানুষ মনে করলেও, কি বুড়োর এরকম আবোল তাবোল বকা উচিত ছিল?

হেমাঙ্গিনী ভাবতে লাগলো: হয়ত বা ভুল দেখেচি! লোকটা তার ভাসুর নন! তাই সম্ভব! তাঁর মুখে কি এসব কথা সম্ভব? কি ঘেন্না!

যাহ'ক, হেমাঙ্গিনী আর পেছন দিকে না তাকিয়ে হন হন করে গন্তব্যের পথে চললো। কিছুদূর এসেই শ্বশুর বাড়ী সম্মুখে দেখে সে হাঁফ ছাড়লো! বাবা! লোকটা তার পেছন নেয়নি ত!

(৩৪)

এর আগে শ্বশুর বাড়ীতে সে অনেকবার এসেছে। কাজেই বাড়ী চিনতে তার ভুল হ'ল না।

এই ত সেই বাঁ দিকে একটা এঁদো ডোবা, আর ডোবার পাশ দিয়ে সরু মাটির রাস্তা। বর্ষাকালে এই সরু রাস্তা দিয়ে যেতে হেমাঙ্গিনী কতবার আছাড় খেয়েছে। এর আগে সে ডোবার জল খুব স্বচ্ছ দেখেছে, কিন্তু এবারে ডোবাটা পানাতে একেবারে বুজে গিয়েছে। তা থেকে একটা সেঁদো গন্ধ অনবরত বেরুচ্চে।

ডোবাতে কতবার সে ঢোঁড়া সাপ দেখেচে। বড় বড় চার হাত লম্বা সাপ, কিন্তু কখনও কারুকে কামড়ায় না। তারা যেন গৃহপালিত গরু বাছুরের মত। খেতে দিতে হয় না, এই যা কথা। তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁজে নেয়।

ডোবাটা শেষ হ'লেই চণ্ডীমণ্ডপ। মাটির দেওয়াল দেওয়া চালা-ঘর, কিন্তু বেশ পরিপাটি। বাড়ীর পুরুষেরা প্রায় সেখানে বসে থাকে। কিন্তু আজ এখন কেউ সেখানে নেই। সকলে গেল কোথায়?

ভেতর বাড়ীতে পৌছবার দরজায় এ কে দাঁড়িয়ে রয়েছে? একে ত হেমাঙ্গিনী কখনও দেখেনি। বেশ মোটা-সোটা কালো-কোলো

হাতীর মত চেহারা। বয়স কিছু হয়েছে, কিন্তু তবু মাথায় খোঁপাটি বেশ সৌখীন রকমে বাঁধা। পরণে কাপড়খানাও বেশ বাহারে। গায়ে অলঙ্কারও অনেক আছে; এত অলঙ্কার হেমাঙ্গিনী এর আগে বাড়ীর কোনও বউয়েরই গায়ে দেখেনি। কে এই মেয়েমানুষটি? পাড়ার কেউ না কি?

হেমাঙ্গিনীকে আসতে দেখে সে আগেই কথা কইলো। জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কে গা?

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিল: আমায় চেন না? আমি এদের বাড়ীর বউ!

মেয়েমানুষটি ভ্রু কুঁচ্কে বললে: বউ? এদের বাড়ীর বউ ত এখন একজন। তুমি আবার কে?

একজন? বাড়ীতে ত দু' বউ থাকে। আর আমি এক বউ। আমি থাকি বিদেশে।

মেয়েমানুষটি একটু ভেবে বললে: ও বুঝিচি! কত্তার কাছে শুনিচি বটে, তাঁর এক ভাই বাইরে কোথায় পাটকলে কাজ করতো। তুমি তার বউ বুঝি?

হেমাঙ্গিনী বললে: হাঁ, আমিই সেই বউ। কিন্তু তুমি কে? আমি ত তোমায় এর আগে এ বাড়ীতে দেখিনি।

স্ত্রীলোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বললে: তা না দেখতে পার। তা'তে কিছু আসে যায় না। এখন আমিই এ-বাড়ীর সব্বে-সব্বা। খবর নিলেই জানতে পার্ব্বে।

বল্‌তে বল্‌তে স্ত্রীলোকটি মাতঙ্গিনীর মত থপ্‌থপে পা ফেলতে

ফেলতে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। হেমাঙ্গিনী তার কথা শুনে আর আচরণ দেখে ত অবাক্।

হাঁগা, ছোট বৌ কোথায়? হেমাঙ্গিনী একটু উচ্চৈঃস্বরেই জিজ্ঞাসা করলো।

মাতঙ্গিনী যেতে যেতে পেছন না ফিরেই উত্তর দিল, কে জানে কোথায় তোমার ছোট বউ।

সে সন্ধান দিল না বটে, কিন্তু ছোট বউ নিজে বাড়ীর ভেতর থেকে উত্তর দিলে, কে ডাকছো গা?

আমি রে আমি। তোর মেজ দিদি।

ভেতর দিক্‌কার একখানা ঘর থেকে একটি ময়লা-কাপড়-পরা আধা-বয়সী মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসে বললেঃ মেজদিদি? কে—তুমি? এস, এস, অনেকদিন পরে তুমি এলে! ওমা, কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার! আর যে চেনবার জো নেই।

হেমাঙ্গিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেঃ আর ভাই! যার দৌলতে এত নপর-চোপর ছিল, সেই-ই চলে গেল! এখন আর কি শরীর থাকে?

তাব'লে এত রোগা হয়ে গেছো? আর এমন বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে?

তোকেই বা কি এমন ভাল দেখচি? তুইও তো একেবারে আধখানা হয়ে গেছিস্!

ছোট বউ কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেঃ হ'ব না? বাসন মেজে মেজে আর ক্ষার কেচে কেচে এখনও যে বেঁচে আছি, এই ঢের। আর কি

সুখ সংসারে আছে? যাঁর সংসার, তিনি ত চলে গেছেন। আমাকে রেখে গেছেন, শুধু গালাগালি আর লাথি-ঝাঁটা খাবার জন্যে।

কথা শেষ হ'তে না হ'তে, উঠোনের অপর দিক থেকে সেই হাতির মত মেয়েমানুষটি মুখ ভেংচে বললে: লাথি-ঝাঁটা আবার কে কবে মারচে? ওঃ! বাড়ীতে কেউ আসতে না আসতেই অমনি তার কাছে লাগান হচ্চে, লাথি-ঝাঁটা খেতে খেতে আমার জীবন গেল! এত মিথ্যে কথাও কইতে পারে সব! আসুক আজ কত্তা বাড়ীতে, এ সবের ব্যবস্থা হবে'খন ভাল ক'রে।

হেমাঙ্গিনী অবাক্ হয়ে গেল মেয়েমানুষটির বাঁকা বাঁকা কথার শ্রী দেখে। ব্যাপারটা কি সে ভাল ক'রে বুঝে উঠতে পারলো না। ছোট বউকে ইসারায় জিগ্যেস করলো: অমন ক'রে তোর মুখের ওপর বলচে, ও কে?

ছোট বউ ভয়ে ভয়ে মুখখানা নত ক'রে খুব মৃদুস্বরে বললে: উনিই এখন ঘরণী-গৃহিণী!

কেন, বড়দি গেল কোথায়?

ওমা, তা বুঝি শোন নি? বড়দি ত আজ বছর দুই হ'ল, মারা গেছে। সে মারা গিয়েই ত আমার এই যন্ত্রণা বেড়েছে।...আরও আস্তে বললে: পোড়া কপাল! আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম, তাই এ জন্মে এক ডোম মাগীর দাসত্ত্বি কত্তে হচ্ছে!

হেমাঙ্গিনীও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো: ডোমমাগী? ছোট বউ মুখ তুলে একবার উঠোনের ওদিকে চেয়ে দেখে নিল, যার বিষয়ে কথা হচ্চে, সে এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। তার ভাগ্যক্রমে সে তখন

শাসাতে শাসাতে অন্য কোথায় চলে গেছে। বউ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ; পরে বললে (তবু তখনও তার চাপাগলায় কথা) : আর বলো কেন মেজদি ! এই দু'বছর ধরে কি শোয়াস্তি যে আমার হচ্চে তা জানেন সেই তিনি, যিনি সব কথাই জানতে পারেন। মাগী এলো এই বাড়ীতে প্রথমে ঝি-গিরি করতে। তারপর দিদি তোমায় আর বলবো কি ! একদিন দেখি বড় কত্তা পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে মাগীর সঙ্গে ফিসির ফিসির কচ্চে। আমি ত লজ্জায় মরে যাই দিদি ! ওমা তার দু'একদিন পরে দেখি মাগী বড়কত্তার ঘরে এটা-ওটা-সেটা ছুতো করে যেতে আরম্ভ করেচে। তার পরেই আরম্ভ হল ঢলাঢলি ! কত্তার ঘরে এখন মাগী নিয়ম ক'রে থাকতে সুরু করেচে। আর কি বেলেল্লা, তোমায় আর কি বলবো ! কারুকেই এখন আর সমীহ করে না। দিনে দুপুরে পাঁচজনের চ'খের ওপর যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করছে !

হেমাঙ্গিনী ত শুনে একেবারে হতভম্ব ! এক ডোম-মাগীর সঙ্গে বড়কত্তা বাড়ীর ভেতর বসে বসে এই ব্যভিচারটা কচ্চে, একেবারে নির্লজ্জভাবে ! সেতো প্রথমে বিশ্বাসই কর্ত্তে চায় না, কিন্তু যখন ছোট বউ একেবারে শপথ ক'রে আরও অনেক কাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বললে, তখন তার অবিশ্বাসটা খানিকটা ধাক্কা খেলে।

পাশে দাঁড়িয়েছিল কাজল। সে নতুন বাড়ীতে এসে, সকলকে অপরিচিত দেখে কাঁদবার সাহস পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। মা'কে চুপি চুপি বললে : মা বড় ক্ষিদে পেয়েচে।

হেমাঙ্গিনী তাকে চুপি চুপি বললে : একটু চুপ কর মা। এখনই ভাত দেবে, খাস খুনি।

কখন দেবে মা ?

ছোট বউ শুনে বললে : ততক্ষণ না হয় দিদি আমার ভাতগুলিই ওকে খেতে দাও। আহা, ছেলে মানুষ! কতক্ষণ না খেয়ে থাকে বলো। সকালে ওকে কিছু খেতে দিয়েছত ?

—খাবে আর কি ? উনুনের ছাই। রেলে আসবার সময় ইষ্টিসনে একপয়সার মুড়ি কিনে দিয়েছিলুম, তাই খেয়েই আছে।

সে অবধি আর কিছু খায় নি ?

আর কোথায় কি পা'ব বলো। তোমাদের যে দেশ, রাস্তায় ত কিছু পাবার যো নেই। এ তো আর সহর নয়, যে দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে দেবো!

কেন, মোড়ের দোকান থেকে কিছু কিনে দিলে না কেন ?

সেখেনে এক মিন্‌সে বসে তেল মাখছিল। আমার সাহস হ'ল না, দোকানের ভেতর গিয়ে কিছু কিনতে। মিন্‌ষেকে যেন চিনি চিনি ব'লে মনে হ'ল। আচ্ছা, আমাদের ভাসুর সেখেনে ছিলেন না ত ?

তিনিই হবে! তিনি ত রোজ এই সময়ে যান মুদীর দোকানে তেল মাখতে।

হেমাঙ্গিনী শুনে শিউরে উঠলো। বললে : তবেই সেরেচে! আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলুম, দেখতে পেয়েছে। মানুষটি বাপু তেমন সুবিধের নয়। আগে ত আমাদের বাসায় কাঁকনাড়ায় প্রায় যেতেন, কই এমনধারা ছিলেন না তো! আজকাল যেন কেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

তুমি কি ক'রে টের পেলে দিদি, একবার দেখে ?

হাঁ, একবার দেখেই বুঝলুম, মানুষটা একেবারে বদ্‌লে গেছে। আমি আসছিলুম, আর আমার দিকে কেমন ভাবে তাকাচ্ছিলেন। মেয়েছেলে দেখে বুড়ো মানুষের ও কি রকম চাহনি ?

হাঁ, পাড়ার অনেকেই ঐ কথা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। তা, আমি কি কর্ব্বো দিদি ? উনি কি আমার বশ, যে বললেই কথা রাখবেন ? আর আমিই বা বলবো কেমন করে ?

যাক্‌গে, সে সব কথা পরে হবে। এখন আমার দুটো পিণ্ডির ব্যবস্থা করে দে দেখি। সমস্ত সকাল পথ চলে আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চি নে।

ছোট বউ কপাল চাপড়ে বললে : পোড়া কপাল সংসারের ! তুমি এলে, তোমায় যে দুটো চাল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করবো, তার ভেতরেও কত গলদ ! চাল, ডাল, তরি-তরকারী সব ঐ মাগীর জিম্মায়। তিনি হুকুম না করলে কিছুতে হাত দোবার যো নেই।

ওমা ! বলিস্ কিরে ছোট-বউ ? এতদূর গড়িয়েছে ? তুই বাড়ীর বউ, আর তোর কোনও অধিকার নেই—চাল-ডালের ওপর ! ঐ কোথাকার-কে ডোম মাগীর হাতে সব ?

কি কর্ব্বো বলো ? যাঁর বাড়ী, যাঁর জিনিষ তাঁরই হুকুম। আমার সোয়ামী ত সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আজ দু'দিন হ'ল মোটে বাড়ীমুখো হন নি। পাশের গাঁ ভ্যাবাগাছিতে দু'দিন ধরে যাত্রা হচ্চে, তিনি দিন রাত ধরে তার তদ্বির কচ্চেন। এমন লোকের হাতেও বাবা আমায় দিয়ে গিছলেন !

মিস্ত্রির মেয়ে

মেয়ে মানুষের এ কি জ্বালা ভাই ? পুরুষের যা ইচ্ছা তাই করবে, আর আমরা তার বিহিত কর্ত্তে পার্ব্ব না ? আমারও ঐ জ্বালা ছিল। হপ্তা পেলেই সমস্ত টাকা তাড়ির দোকানে উবুড় করে আসতেন। এ দিকে বাড়ীতে মাগ-ছেলে যে কি খায়, তার খবর নেই।

পোড়া কপাল ! বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্ম না-ত, যেন গো-জন্ম ! গরুগুলোও এর চেয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পায় ! দু'বেলা দু'টি ঘাস বিচালি তারা বিনা আপত্তিতে খেতে পায় ! কিন্তু আমার ঘাস-বিচালি অনেক চোখের জল ফেলে তবে মুখে এসে জোটে।

এখন উপায় ? দু'টি ভাত না পেলে ত একেবারেই মরে যাব আমি ! তারপর ঐ মেয়েটাকেও সঙ্গে ক'রে এনেচি। ওরও তো দু'বেলা দুটি করে চাই।

হাঁ মেজদি ? তোমার বড় মেয়ে নয়নতারাকে যে তোমার সঙ্গে দেখচিনে ? তার কি বিয়ে দিয়ে দিয়েচ না কি ?

বিয়ে আর তার দিতে পারলুম কৈ ? তার আগেই ত তার বাপ চলে গেল। এখন, এই বড় মেয়েকে নিয়েই ত আমার যত জ্বালা !

বিয়ে দাওনি, তবে কোথায় রেখে এলে তাকে ?

যে যায়গাটায় হেমাঙ্গিনীর সকলের চেয়ে ক্ষত বেশী, ছোট বউ হঠাৎ সেই যায়গায় আঘাত করলে। হেমাঙ্গিনীর স্নায়ুগুলো ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো ছোট বউয়ের প্রশ্নে।

মাথায় রক্ত খানিকটা চল্‌কে উঠলো। স্থানকাল পাত্রের কোনও বিচার না ক'রেই সে বলে বসলো : সে পোড়ারমুখীর কথা আমায় আর

জিগ্যেস করো না তোমরা। তিনি এক হিন্দুস্থানী মেড়োর পাল্লায় পড়েচেন। গোঁ ধরেচেন তাকে বিয়ে কর্ব্বেন।

ছোট-বউ গালে হাত দিয়ে বললে : ও মা, সে কি কথা গো! বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, মেড়োকে বিয়ে কর্ব্বে কি? তা হ'লে যে জাত যাবে? এখেনে এঁরা শুনতে পেলে যে কুরুক্ষেত্র কর্ব্বেন?

কুরুক্ষেত্র হ'বার আর বাকি কি? জাতজন্ম সব খেলে, বাপ পিতামহর নামটা ডোবালে। আমি এত ক'রে বারণ কচ্চি, এতো বোঝাচ্চি, কিছুতে না। সেই এক কথা, তাকে বিয়ে কর্ব্বে।

ও মেড়োটার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'ল কোথায়? এত ঝোঁকই বা কি ক'রে হ'ল?

ঐ লাইনেই দেখা সাক্ষাৎ। পাটকলের লাইনে ত আমরা থাকতুম। সেখেনে সব রকম জাতই পাশাপাশি বাস করে। এই ছোঁড়াটা প্রায় আমাদের বাসায় আসতো, নয়নের বাপের কাছে সে কাজ করতো। ঐ আসতে-আসতেই কেমন দু'টোতে মনের মিল হয়ে গেল। দুটোরই তো ডব্‌কা বয়েস, আমি ঠেকাতে পারলুম কই বলো?

ছোট বউ কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থেকে বললে : দিন দিন কি হ'তে চললো গা মেজদি? মেড়োর বউ হবে বাঙ্গালীর মেয়ে? তুমি বাপু এসব কথা আর কারুকে বলোনা এখেনে। আমাকে যা বললে, তা বললে! আর কেউ যেন শুনতে না পায়। তা হ'লে তোমাকে এখানে সকলে একঘরে করবে। কত্তা হয়ত শুনে তোমাকে বাড়ীতেই থাকতে দেবেন না।

হেমাঙ্গিনী ছোট বউয়ের কথা শুনে একটু ভয় পে'ল। এ থেকে

যে এতটা গোলমাল উঠতে পারে একথাটা এতদিন তার মাথায় ঢোকেনি। আজ যেন একটা নতুন পেরেক তার মাথার মধ্যে সজোরে ঢুকে গেল। আশঙ্কার আকুলতায় সে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলো।

ছোট বউ তাকে নীরব দেখে, আর সে বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে বললে: থাক্ এখন সে কথা। এখন একবার যাই দেখি ঘরণী গৃহিণী যদি দয়া ক'রে তোমার জন্যে দুটি চাল বার ক'রে দেয়। আর আমার ভাতটা ততক্ষণ না হয় তোমার মেয়েকে দি। আয়রে খুকি, আমার সঙ্গে যাহ'ক দুটি খাবি আয়।

ছোট বউ কাজলের হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। হেমাঙ্গিনী বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

(৩৬)

ওদিক্‌কার একটা ঘরের দরজায় সেই মোটা-সোটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মেয়েমানুষটি এসে দাঁড়াল। ছোট বউয়ের তখন কাজলকে খাওয়ান শেষ হয়েছে। সে তার কাছে আস্তে আস্তে এসে বললে: কিছু চাল বের করে দিতে হবে যে? মেজদি এসেছে, ও খাবে দাবে তো?

মেয়ে মানুষটি মুখখানা কেমন একরকম ক'রে বললে: কে খাবে না খাবে, তা আমি কি কর্ব্বো? কর্ত্তা আসুন, তিনি যা বলেন তাই হবে।

ছোট বউ বিরক্তির সুরে বললে: ওমা সে কি কথা! কর্ত্তা যদি এখন তিন পহর বেলাতে আসেন? ততক্ষণ মানুষটা উপোষ করে থাকবে?

আমি ত কারুকে এখেনে উপোষ ক'রে আসতে বলিনি।

ছোট বউ একটু ঠাণ্ডাভাবে বললে : তুমি তো বলো নি, কিন্তু ওতো উপোষ করে থাকবে। ওরও তো এখেনে অধিকার আছে।

মুখটা পেছন দিকে ফিরিয়ে মেয়ে মানুষটি উত্তর দিল : অতো শতো আমি জানিনে বাপু! কত্তা এখনই আসবেন, তাঁর কাছে তোমরা বোঝাপড়া করে নাও। আমার ওপর যেমন হুকুম আছে, তেমনি বললুম।

—তা হ'লে চাল দেবে না তুমি ? ও উপোষ করেই থাকবে ?

—আ গেল যা! তা আমি কি কর্ব্বো ? আমার কি চাল, যে আমি দান-খয়রাত কর্ব্ব ? ভাল আপদ দেখি।

আরও কতদূর গড়াতে পারতো, তা বলা কঠিন। তবে এই জ্বলনোন্মুখ অগ্ন্যুৎপাতটা হঠাৎ চাপা পড়ে গেল হেমাঙ্গিনীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যে, কত্তার সময়োচিত আগমনে।

'কইগো, গণু কোথায় ?' একটা গুরু-গম্ভীর স্বর শোনা গেল অন্দরের দরজায়।

কত্তার গলার স্বর শুনে, মেয়ে মানুষটি এগিয়ে এল দরজার দিকে। বেশ স্নেহসিক্ত স্বরে বললে : ও মা! এই এত বেলা করলে তেল মেখে আসতে ? হাঁগা, তা নিজের শরীরের ওপর কি একটু মায়া-দয়া রাখতে নেই ? এই যে রোজ রোজ পিত্তি পড়াচ্ছ, এর পরে অসুখ হ'লে কে ভুগবে বল দেখি ?

—হেঁ হেঁ গণু, বাড়ীর কর্ত্তার কি নিজের শরীরের দিকে তাকাবার অবসর থাকে ? বলে, নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই, তা আবার শরীর

দেখা।...তুমি দাও দাও গামছাখানা এগিয়ে দাও, একটা চুবুনি খেয়ে আসি।

—তা, এতক্ষণ কাটাচ্ছিলে কোথায়?

—ঐ গিছলুম সস্তা তেলির দোকানে একটু তেল মাখতে! সেই খেনেই কথা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেল। সব তো আমাকেই করতে হবে, আর তো কেউ কিছু দেখবে না। আর সব আছেন খেতে, আর আমি শালা আছি মোট বইতে।

গণু সহানুভূতির জালা উজোড় ক'রে বললে: তাই না তাই? একটা মানুষ যে খেটে খেটে মরতে বসেছে, তার বেলা কারুর চোখ নেই!...কি সংসারই হ'ল গা! সব পর নিয়ে বাস, আপনার বলতে কেউ নেই! তা আমিও বলি বাপু, তোমার এতদূর রাস্তা হেঁটে তেল মাখতে যাওয়া কেন? বাড়ীতে কি তোমার জন্যে একটু তেল জোটে না? আর সকলে ত দিব্যি কলুর বাড়ীর কুপো'র মত তেল মাখচে!

—তারা মাখবে না কেন? তাদের ত রোজগার করে আনতে হয় না! যাকে আনতে হয় সেই বোঝে! আমি কি যাই সাধে? ঐ যেটুকু সাশ্রয় হয়, সেই টুকুই আমার খাটুনি বেঁচে গেল।

তা যাও, যাও, এখন তুমি তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসো। এই নাও গামছা।

গণু গামছাখানি এগিয়ে দিল, কর্তা সেখানি হাতে ক'রে পেছন ফিরলেন। ফিরতেই নজরটা গিয়ে পড়লো এদিককার রোয়াকে উপবিষ্ট আধ-ঘোমটা-টানা মেয়েমানুষটির ওপর।

—এরা আবার কারা এলেন ?

গণু উত্তর দিল : কে জানে বাপু, কারা এলেন, তোমার আপনার জন। আমি চিনিনে শুনিনে কারুকে।

রোয়াকের ওধারে দাঁড়িয়েছিল ছোট বউয়ের একটি ছেলে। সে বললে : মেজ জ্যাঠাইমা এয়েচেন।

কত্তা পিট্ পিট্ ক'রে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন : মেজ জ্যাঠাইমা ? সে আবার কে ?

ছোট বউ ছিল কাছে। সে হন্ হন্ ক'রে ছেলের কাছে গিয়ে তার কাণে কাণে বললে : বল্ না, মেজ জ্যাঠাইমা, যাঁরা কাঁকনাড়াতে থাকেন।

ছেলে পাঠশালার পোড়োর মত মায়ের কথা আওড়ে গেল। কর্ত্তা শুনে, ভ্রু দুটো কুঁচকে, খানিকটা ভেবে বললেন : ও বুঝিচি ! কালির বউ বুঝি ? তা এখেনে হঠাৎ আগমন কেন ?

এ প্রশ্নের কেউ কোনও উত্তর দিল না। কর্ত্তা ততক্ষণ অনিমেষ নেত্রে কালির বউয়ের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি তাকে গিলে খাবেন, কি চিবিয়ে খাবেন, সেটা যেন ভাল ক'রে বুঝে উঠতে পাচ্ছিলেন না।

এই নারী-অতিথিটির দিকে এতক্ষণ ধরে কর্ত্তা চেয়ে রয়েছেন দেখে গনু একটু অধৈর্য্য হ'ল। সে বললে : যাও না, তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসো না, তার পরে এসে ও সব ঘর-সংসারের ব্যবস্থা করো'খন !

কর্ত্তা চম্‌কে উঠে বললেন : হাঁ যাই !

(৩৬)

ক্ষুধায় প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্চে, তবু হেমাঙ্গিনীর মুখে কথা নেই।

সমস্ত সকালটা পথ হেঁটে হেঁটে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর, ক'দিন ধরেই তার মনের ভেতর এমন ঝড়-ঝাপটা দিন রাত অবিশ্রান্ত ভাবে চলেচে যে, সে আর বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলো না; কাজলকে কাছে টেনে নিয়ে সে মেঝের ওপর আঁচলটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। যেমনি শোওয়া, অমনি ঘুমের আকর্ষণ।

ভগবান্ মানুষকে ঐটুকু সুখ চিরদিন দিয়ে থাকেন। দুঃখের সাগরে তাঁর সান্ত্বনার দ্বীপটি চিরদিন নিদ্রার বালুচরে ঠেলে ওঠে। এ-দ্বীপটি যদি তিনি নির্ব্বিচার করুণার মত দুঃখীকে না দিতেন, তা'হলে তাদের চিরদগ্ধ কঙ্কাল-অঙ্গারে পৃথিবী এতদিন নিরবকাশ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেতো। ক্ষুধার পেষণে আর মানসিক দাহে সৃষ্টি এতদিন নির্জীব জড়ত্বে পর্য্যবসিত হ'ত।

কতক্ষণ যে হেমাঙ্গিনী ঘুমিয়েছিল, তা তার খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল কি একটা শব্দে!

চেয়ে দেখে,—কি লজ্জা! দরজার সম্মুখে ভাসুর দাঁড়িয়ে! তার দিকে চেয়ে আছেন, যেমন বিড়াল চেয়ে থাকে ঢাকা-খোলা মাছের ওপর। এদিকে তার কাপড় চোপড় সমস্তই ঘুমের স্বাধীন ব্যভিচারে একেবারেই বিপর্য্যস্ত! সে কোনও রকমে তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গ ঢাকা দিয়ে উঠে বসলো। মাথায় ঘোমটাটা অনেকটা টেনে দিল।

কর্ত্তা খানিকটা গাল-ভরা হাঁসি হেঁসে বললেন : হেঁ, হেঁ, চাল পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, পেয়েছো ত ?

হেমাঙ্গিনী কোনও কথা কইলো না।

—বলি, খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?

হেমাঙ্গিনী কি ক'রে জানাবে, যে তার খাওয়া হয় নি। ভাসুরের সঙ্গে কি কথা কইতে আছে ? ভাসুর কিন্তু লম্বা একটা অনুমতি ছেড়ে দিলেন।

—কথা তুমি কইতে পার। কথা না কইলে চলবে কি করে ? এক বাড়ীতে থাকতে গেলে কথা না কইলে কি চলে ? হ'লেই বা ভাসুর !

হেমাঙ্গিনী তবু লজ্জার হাত এড়াতে পারলে না। কর্ত্তা তখন আস্তে আস্তে আপনার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

একটু পরেই ছোট বউ এল। এসে বললে : দিনটা তো ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে ! খাবে কখন্ ? আমি তোমার ভাত-টাত রেঁধে তোমাকে ডাকতে এসে দেখি, তুমি নাক ডাকাচ্ছ ! কাজেই আর ডাকলুম না। কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে তুমি ঘুমোবে, তাই বা কেমন ক'রে জানবো ?

হেমাঙ্গিনী ছোট বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : আচ্ছা ছোট বউ, ভাসুর তো দেখলুম নেহাত্ মন্দ লোক নয় ! এই তো এই মাত্র এখেনে এসে আমার খবর-টবর নিয়ে গেলেন ! কিন্তু তোমরা যে রকম বলছিলে, তাতে যেন আমি অন্য রকম ভেবে ছিলুম !

—তাই'লে তোমার ভাগ্যি ভাল, মেজদি ! আর জন্মে কোন্ পুণ্য করেছিলে, তাই এ জন্মে ওঁর সুনজরে পড়েচো।

—তা হবে। কিন্তু আমি ত কিছু খারাপ লোক দেখি না। এই ত ধরো না, আমার জন্যে চাল টাল সব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—তাইতো দেখলুম। এ রকম হ'তে ত বড় দেখতে পাই নে। বাইরের কোনও আত্মীয়-স্বজন এলে ত মুখ থেকে ঝাঁটা-বৃষ্টি করতে থাকেন। যতদিন না সে বাড়ী থেকে দূর হয় ততদিন যেন গোখ্‌রো সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে গজরান। তোমার ওপর কেন যে হঠাৎ এমন প্রসন্ন হ'লেন,—এ বড় আশ্চয্যি ব্যাপার।

—আমার ওপর মার-মুখো হবার ত কোন কারণ নেই। বরং ভাল চ'খে দেখবারই কথা। ভাই বেঁচে থাকতে প্রায়ই তো আমাদের ওখানে গিয়ে টাকাটা, কড়িটা, কাপড়টা, জামাটা চেয়ে নিয়ে আসতেন। আজ আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে ব'লে আমাকে হেনস্থা কর্ব্বেন কি ক'রে ?

এত প্রমাণ সত্ত্বেও ছোট বউ স্বীকার করতে চায় না যে উনি খুব উঁচু দরের লোক। মুখে বল্লে : অত সাদা-সিধি লোক ত ওঁকে কখনও হ'তে দেখি নি। ......তা হবে, মানুষের চক্ষুলজ্জা ব'লে ত একটা জিনিষ আছে ? তা, থাক্ ভাই, তুমি এখন ওঠো......চলো ও ঘরে, আমি ভাত বেড়ে রেখে এসেছি।

—আর এখন এত বেলায় ভাতে বসবো না। তার চেয়ে কাপড়-খানা পুকুরঘাটে কেচে আসি। তারপর, সন্ধ্যে হ'লেই পোড়া পেটের হাঙ্গামা করবো'খন।

(৩৭)

খেয়ে দেয়ে হেমাঙ্গিনী কাজলকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট ঘরে শুয়ে পড়েছে। ঘরের কোণে মিট্ মিট্ ক'রে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। হেমাঙ্গিনীর চক্ষে মোটে ঘুম আসছিল না, কেননা, বিকেলটার অনেকটা সে ঘুমিয়ে নিয়েচে। নিদ্রাদেবী চিরদিনই বড় হিসেবী ব্যবসাদার। কোন খদ্দেরকে পাওনা-গণ্ডার চেয়ে একটি কাণা কড়িও বেশী দেয় না। যদি কখনও ভুলে দিয়ে ফেলে, পরের ক্ষেপে তা উসুল করে নেয়। মাড়োয়ারীও বোধ হয় এত চুল চিরে দেনা-পাওনা করে না।

চখে ঘুম না আসাতে হেমাঙ্গিনীর মনে কত রকমের চিন্তা আগাছার মত ঠেলে উঠতে লাগলো। প্রথমেই এলো নয়নতারার কথা। উঃ, মেয়েটা কি একগুঁয়েই হয়েছে! সেই যে ধরেচে লছমনের পেছন, কিছুতেই তাকে ফেরান গেল না! ও ঠিক ওকে বিয়ে করবে! তা না হ'লে, ওকে বাঁচাবার জন্যে এত উঠে-পড়ে লেগেচে কেন? এমন ঢলা-ঢলি করছে কেন? নিজের জাত-জন্ম সব খোয়ালে দেখচি! পোড়া কপাল! অমন মেয়ে পেটে না ধরলেই হতো ভাল!

রাগে হেমাঙ্গিনার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। তার জন্যেইত তার এতো কষ্ট! নইলে এই পাড়াগাঁয়ে ভাসুরের ভিক্ষা কুড়োতে সে আসবে কেন? কাঁকনাড়াতেই তো সে থাকতে পারতো একরকম খেটে খুটে খেয়ে! এখানে কি আর এরা আদর করে রাখবে?

তা, ভাসুর মানুষটা ভাল। এইত বিকেল বেলায় এসে সব খবর টবর নিলেন! আবার রাত্রেও জিগ্যেস-বাদ করলেন, আমি কোন্ ঘরে শোব, একা শোব কিনা, ভয় কর্ব্বে কিনা,—এই সব! বোধ হয় আমাকে অযত্ন কর্ব্বেন না।

তবে আর দরকার কি নয়নতারার কাছে থেকে! সে চোখের সুমুখে এক মেড়োকে নিয়ে নেচে নেচে বেড়াবে, আর আমি তাই দেখবো? মায়ের কি এসব সহ্য হয় চোখের ওপর? না বাপু, আমি তা পার্ব্বো না। সে যা হয় করুক গে, মরুক গে,—আমি এইখেনেই এক রকম ক'রে পড়ে থাকবো।

কিন্তু, এখেনেই বা কি কাণ্ড! ভাসুর তো বুড়ো হয়েচেন, ওঁর কি উচিত এই বয়সে এক ডোম-মাগীকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢলাঢলি করা! বাড়ীতে একটা ভাদ্র-বৌ রয়েচে, ছোট ভাই একজন বেঁচে রয়েচে, ছেলে পুলেরা যা হ'ক বড় সড় হচ্চে! এ অবস্থায় একটা ছোটলোকের মেয়েকে নিয়ে উনি কি ক'রে দিন কাটাচ্চেন! পাড়ায় পাঁচজনে কিছু বলে না? বলে বোধ হয়! কাল একবার খবর নেবো।

আচ্ছা, উনি যদি পাড়ার পাঁচজনের মধ্যে থেকে, বাড়ীর মধ্যে এক নীচ জাতের খান্‌কি মাগীকে নিয়ে সমাজের মাথা হয়ে থাকতে পারেন, তাহলে ওঁর তুলনায় আমার নয়নতারা কি এমন অপরাধী? মেড়ো? মেড়োত ডোমেদের চেয়ে ঢের উঁচু জাত! ওদের ভেতরে ত অনেক ভদ্রলোক আছে! অনেক মেড়ো ত বেশ বড়লোক আছে! অন্ততঃ ডোমের চেয়ে ত মেড়ো খারাপ জাত নয়!

তবে?

হেমাঙ্গিনীর মাথাটা চল্‌কে গেল, এই সব কূট-তর্কের ঢেউয়ের আঘাতে! তাইতো, তবে আর হেমাঙ্গিনী নয়নতারার ওপর অভিমান করে থাকে কেন? অমন ভাসুরের বাড়ীতে থাকার চেয়ে, তাহ'লে ত নিজের পেটের সন্তানের কাছেই থাকা ভাল।

পাড়াগাঁয়ের নিশুতি রাত, কোথায় কোনও শব্দ নেই। বাড়ীর সকলেই যে যার নিজের ঘরে দরজা বন্দ করে ঘুমুচ্চে। হেমাঙ্গিনী সন্ধ্যে হতে না হতেই দু'টি শুকনো ভাত যাহ'ক তাহ'ক ক'রে খেয়ে নিয়েচে, কাজলকেও তার থেকে কিছু ভাগ দিয়ে তারও ক্ষুন্নিবৃত্তি করেচে। তারপর, যখন সকলে খাওয়া দাওয়া ক'রে শু'তে গেল, সেও এসে এই ঘরটিতে একা কাজলকে নিয়ে শুয়ে পড়েচে। কিন্তু চ'খে ঘুম আসচে না। বিকেল-বেলায় খুব খানিকটা ঘুম হয়ে গেছে বলে' বোধ হয় আর তার চোখ পাতায় পাতায় লাগতে চাইচে না। চোখের দরজা বন্ধ না হ'লে মাথার মধ্যে কতো রকম হাওয়া খেলতে থাকে। হেমাঙ্গিনীর মাথায় অনেক রকমের ঝড়-ঝাপ্‌টা, গরম হাওয়া, ঘুর্ণী হাওয়া, পাগলা বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ কি একটা শব্দে সে চম্‌কে উঠলো। তার মনে হ'ল, দরজায় কে টোকা মারচে। চোর না কি? কি সর্ব্বনাশ! সে একা মেয়েমানুষ এক ঘরে শুয়ে আছে, চোর এলে তাকে ঠেকাবে কি ক'রে? সে একটু ভয় পেলো।

আবার ঠুক্ ঠুক্ ক'রে শব্দ হ'ল। চোর কি এমন ক'রে দরজায় টোকা মারে? তাহ'লে বোধ হয় ছোট বউ! কি একটা দরকারে এ ঘরে একবার আসতে চায়!

সে কথা-কয়ে জিজ্ঞাসা করলে : কে, ছোট বউ না কি ?

কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু আবার ঠুক্-ঠুক্ !

কে গা ?

চাপা গলায় উত্তর এল : আমি। একবার দরজাটা খোল না !

সর্ব্বনাশ ! এযে কর্ত্তার গলা ! তিনি এত রাত্রে ডাকেন কেন ?

হেমাঙ্গিনী ত ভাসুরের সঙ্গে কথা ক'বে না। কাজেই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। কিন্তু তবু দরজা খুলতে তার সাহস হ'ল না। সে চুপ ক'রে রইলো।

"মেজ বউ ? দরজাটা একবার খোল। এক গেলাস জল নেবো। আমার ঘরের জল ফুরিয়ে গেছে, তাই এঘর থেকে নিতে এসেচি।"

জল নেবেন, তা এত চাপা গলা কেন ? যাহ'ক, ভাসুর যখন জল চাইচেন, তখন না দিয়ে সে থাকে কেমন করে ? কাজেই হেমাঙ্গিনী উঠে খিলটা খুলে দিল।

কর্ত্তা দরজা ঠেলা দিয়ে খুলে বললে : ভয় নেই একটু জল নেবো কিনা, তাই এসেচি। তা, হাঁ মেজ বউ ? তুমি আমাকে এত ভয় কচ্চ কেন ?

বলতে বলতে কর্ত্তা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। কোণে যে মেটে প্রদীপটা জ্বলছিল, তার আলোতে হেমাঙ্গিনী দেখলো, কর্ত্তা এসে ঘরের চৌকি-খানাতে বসলেন। হেমাঙ্গিনী এক গেলাস জল গড়িয়ে মাটিতে রাখলো।

বেশ আদুরে আদুরে কথায় কর্ত্তা বললেন : আমার হাতে তুলে দাও, লক্ষ্মীটি ! এখন ত বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়েচে ; এখন আমার সঙ্গে একটু কথা কইতে দোষ কি ?

কর্ত্তার কেমন-কেমন কণ্ঠস্বরে আর নির্জ্জন ঘরে আলাপ কর্ব্বার প্রয়াসে হেমাঙ্গিনী বড় সন্দিহান হ'ল। আর কি কথা ভাসুর বলে? এ সব কথা কি ভাসুরের মুখে শোভা পায়? বড় ভয় কর্ত্তে লাগলো তার।

হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। সেখানে দাঁড়িয়ে, পালাবে কিনা তাই ভাবছিল। এমন সময় কর্ত্তা আবার হঠাৎ বললেন: অত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? কাছে এসো না! আমার পাশে এসে বসো না?

তাড়ির গন্ধ এসে নাকে ঠেকলো হেমাঙ্গিনীর। এ গন্ধ তার কাছে ভুল হ'বার নয়! তার স্বামী এ গন্ধ নিয়ে কত দিন ঘরে এসেছে। এই গন্ধের জন্যই তো তাদের অবস্থা এত শোচনীয়!

ভাসুরের মুখ থেকেও সেই গন্ধ এলো। এই মাতাল অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে যে প্রস্তাব এলো, তা শুনে হেমাঙ্গিনীর মাথা ঘুরে গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালাতে গেল।

কিন্তু যেই দরজা দিয়ে বেরুবে, অমনি কর্ত্তা এসে তার আঁচলটা ধরে ফেললেন। হেমাঙ্গিনী বিশেষ বিরক্ত হয়ে বললে: ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন! আমি যে আপনার ভাদ্র বৌ!

—আরে, হ'লেই বা ভাদ্র বৌ! তোমারও এখন সোয়ামী নেই, আমারও এখন পরিবার নেই! দু' জনে মিলবে ভাল! কেন পড়ন্ত যৌবনটা বাজে-বাজে কাটাবে? তার চেয়ে এসো, দু'জনে বসে—

আঁচলটায় টান দিয়ে হেমাঙ্গিনী বললে: ছি ছি, অমন কথা বলবেন না। আমি বিধবা মানুষ, আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না।

—সর্ব্বনাশ? হা-হা-হা-হা! মেজবৌ? যৌবন থাকতে জীবনের সুখ বাদ দিতে নেই! যে সেটা বাদ দেয়, সে বেটা আহাম্মক। সর্ব্বনাশ আবার কি,—এই তো সর্ব্ব-রক্ষে!

আর একবার কাপড়খানা ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে হেমাঙ্গিনী বললে: আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে রেহাই দেন। আমি কালই আপনার বাড়ী থেকে চলে যাবো, আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট কর্বেন না।

—না, না, নষ্ট কর্ব্বো না, সব জল-জ্যান্ত বাঁচিয়ে রেখে দেবো। এখন তুমি এসোদিকি আমার কোলে।—

ব'লেই একলাফে কর্ত্তা হেমাঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। হেমাঙ্গিনী ভয়ে একেবারে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলো: ওগো, কে কোথায় আছ, শীগ্‌গীর এসো। আমার সর্ব্বনাশ করলে।

হেমাঙ্গিনীর চিৎকার শুনেই কর্ত্তা বললেন: তবে রে শালী! আবার চেঁচানো! হাত দিয়ে হেমা'র মুখখানা একেবারে চেপে ধরতে গেলেন।

কিন্তু যেটুকু চিৎকার কর্ব্বার সুযোগ হেমাঙ্গিনী পেয়েছিল, তা'তেই পাশের ঘরে ছোট বউ জেগে উঠলো, এবং কি একটা বিষম কাণ্ড হচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটে এলো।

ও ঘর থেকে গণুও ছুটে এলো শশব্যস্তে। কর্ত্তাকে আপনার ঘরে না দেখতে পেয়ে, সেও বুঝতে পেরেছিল কর্ত্তাই বুঝি একটা কাণ্ড বাধিয়েছেন। গুণীই গুণীর মহিমা বুঝতে পারে!

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

—তবে রে শালী? আমার বাড়ীতে চেঁচামিচি! ভাল কথা বললুম, তাতে তোর মন্দ হ'ল? চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ীর সব লোককে জাগিয়ে তুললি?

বলেই কর্ত্তা সজোরে এক ধাক্কা মারলেন হেমাঙ্গিনীকে। নিরপরাধা অনাথা তখনই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো। ছোট বউ এসে তাড়াতাড়ি কর্ত্তাকে বাধা দিল।

গগ্ন এসে জিজ্ঞাসা করলো: কেন, ওকে অমন ক'রে মারচো কেন?

মারবো না? শালীর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে এসে আমাকে এমন ক'রে অগ্রাহ্যি!

কি অগ্রাহ্যি করেছে?

কি অগ্রাহ্যি করেছে, বলবো শুনবে? মাগী ঘরে মানুষ ডেকে এনেছিল! আমি আমার ঘর থেকে দেখতে পেয়ে যেমন এখেনে এসেচি, অমনি লোকটা ঘরের দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি ধরতে যাচ্ছিলুম, মাগী এসে আমার কাপড় টেনে ধরলে! মাগী দুশ্চরিত্তির! একদিন এসেই বাড়ীতে মানুষ ডেকেচে!

ওমা, কি সর্ব্বনাশ! বলে গগ্ন গালে হাত দিল।

ছোট বউ বললে: ওকে মারলেন, আবার উলটে বদনাম দিচ্চেন!

দেবো না? আমার পবিত্র বংশে কলঙ্ক ঢাললে, বদনাম দেবো না? শুধু বদনাম দেবো? ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বাড়ীছাড়া কর্ব্বো!

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে। তার নাক দিয়ে রক্ত ছুটছিল, তবু সে সব অগ্রাহ্য ক'রে, একটুমাত্রও না কেঁদে সে ফণিনীর

মত উঠে বসে বললে : আপনিই তো আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলেন, আবার উল্‌টে আমার নামেই কলঙ্ক দিচ্চেন ?

— কি বললি ? আমি তোর সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলুম ! ওরে কলিকাল ! দিন দিন দিন-কাল হতে চললো কি ! আমার নামে পাড়ার কেউ কখনও কোনও দোষ দিতে পারে না, আর তুই বলিস্ কি না, আমি তোর সর্ব্বনাশ করতে এসেচি ? তবে রে হতভাগী মিথ্যুক ! আজ তোকে কেটে খুন করবো !

কর্ত্তা আবার ছুটলো হেমাঙ্গিনীকে মারতে। ভাগ্যে গণু তাকে পেছন দিক থেকে সজোরে ধরে ফেললে, নইলে আজ হেমাঙ্গিনীর জীবন শেষ হতো। গণু কর্ত্তাকে বেশ চিনতো, কাজেই তার সহানুভূতি এলো হেমা'র উপর ! নারী হাজার কলঙ্কিনী হলেও, অন্য নারীকে ধর্ষিতা হতে দেখলে, প্রাণপণে তাকে রক্ষা করতে যায়। তার নারীত্ব তখন কলঙ্ককে পশ্চাতে রেখে ছুটে আসে অস্বাভাবিক সমবেদনায়।

গণু ধরে ফেললেও কর্ত্তা গজরাতে লাগলেন : দূর হয়ে যা মাগী, আমার বাড়ী থেকে ! গণু, আগে ওকে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও, তা না হ'লে আমি কিছুতেই ঘরে যাবো না। একটা বেশ্যা মাগীকে আমার বাড়ীতে কিছুতেই থাকতে দেবো না। লোকে আমায় বলবে কি ? আমায় যে একঘরে করবে ?

একথা শুনে হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে উঠে বললে : আমিও আপনার বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকতে চাইনে। আমি এখনই এই রাত্রেই এখান থেকে চলে যাচ্চি।... চল্ কাজলা, আমরা চলে যাই। আমার ভাগ্যি যে আজ আপনার হাত থেকে রক্ষে পেয়েছি।

চেঁচামেচিতে কাজলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কাজলকে কোলে তুলে নিয়ে হেমাঙ্গিনী তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। ছোট-বউ অনেক বারণ করলে, তাকে ধরে রাখবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু অত্যাচারিতা হেমাঙ্গিনী কোনও কথা না শুনে, কাজলকে কোলে তুলে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে তখনই বাড়ীর বাহির হয়ে গেল।

(৩৮)

হায় হতভাগিনী নারী! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠো! যে পৃথিবীতে শুধু দৈহিক বলই একমাত্র প্রথম ও শেষ বিচারক, সেখানে স্থায়ের যুক্তি কোন রকমেই আসন পাততে পারে না! সেখানে তুমি শুধু অভিমান আর বিফলতার সাহায্য নিয়ে কি ক'রে বিজয় আকাঙ্ক্ষা করতে পার? পরাজয় যে তোমার অবশ্যম্ভাবী! যাকে বিধাতা চিরদিনই পুরুষের চেয়ে হীনবল ক'রে রেখেচেন, অত্যাচারের প্রতিশোধ দেবার তার ক্ষমতা কোথায়?

হেমাঙ্গিনী পাল মশায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু রাস্তায় উঠতে না উঠতেই সে বুঝতে পারলে তার নিজের ভুল। সে মেয়ে মানুষ, এই ঘোর রাত্রে পথ চলবে কেমন করে? বাহিরে বেরিয়ে সে দেখলে, টিপি টিপি বৃষ্টি হচ্চে, আর পাড়গাঁয়ের রাস্তায় আলোর অছিলা মাত্রও

নাই। পথ-ঘাট ত ভাল করে তার জানা নেই। কাজেই এই বর্ষার অন্ধকার রাত্রে অজানা জঙ্গল পথে সে চলে কেমন করে?

অভিমানের উত্তেজনায় সে খানিকটা এগিয়ে গেল মরি-বাঁচি ক'রে। কিন্তু তার পর পড়লো বিপত্তিতে।

পথ সঙ্কীর্ণ, দু'পাশে গাছ-পালার ঝোপ। ঝিঁ-ঝিঁ-পোকা ডাকচে যেন মৃত্যুর পুরীতে জীবনের নিষিদ্ধ সঙ্গীতের মত। দূরে ও নিকটে কখনও কখনও শেয়াল ডাকচে মানুষকে নিয়মভঙ্গের তিরস্কার করে।

এখন যে তারাই পৃথিবীর রাজা, এ কথাটা জানাবার জন্য তাদের কি বিরাট ভৈরব চিৎকার! এ চিৎকারে সাহস পাওয়া দূরে থাকুক, হেমাঙ্গিনী আরও যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হতে লাগলো।

পথে জনমানব নেই। মাঝে মাঝে দু'চারটে নিশাচর পশু এ ঝোপ হ'তে ও ঝোপে যাচ্চে, তারই শব্দ রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ কচ্চে। সাপ-খোপ যাওয়ার শব্দও হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারলে। তার বড় আশঙ্কা হতে লাগলো, হয়তো কোন সময়ে কোন্ অজগর সাপ তাকে এমন একটা কামড় দেবে, যে তখনই হয়তো তাকে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হবে। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু কাজলের কি হবে? তাকে কে দেখবে? আবার ভয় হ'ল, যদি তাকেই সাপে কামড়ায়? হেমাঙ্গিনী এ চিন্তায় একেবারে শিউরে উঠলো। তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিতে লাগলো। কেন সে অভিমান ক'রে বাড়ী থেকে বেরুলো? কাল সকালেই তো গেলে হতো! রাতটা কোনও রকমে ভাসুরের গালাগালি খেয়েও, তাঁর বাড়ীতে কি কাটাতে পারতো না? তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বললে, না, তা তুই পারতিস্ নে! পারলে তোর শরীরে আর

হাড়গোড়গুলো আস্ত থাকতো না। তোকে রেখে যেতে হ'তো এই শরীরটা, ঐ বাড়ীতে!

পথের পাশে যে সব পুকুর ছিল, সেগুলো আবছায়ার মত তার ঠেকতে লাগলো! হেমাঙ্গিনীর মনে হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, যদি অন্ধকারে কাজলকে নিয়ে এর ভেতরে পড়ে যায়? সে মরে, তাতে ক্ষতি নেই,—কিন্তু কাজল?

পথ পেছলও তেমনি। দু'তিনবার সে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেছে। কিন্তু আর কতদূর হাঁটবে সে? এমনি ক'রে কতক্ষণ হাঁটা যায়? কাজল ঘুমুচ্চে তার কাঁধের ওপর শুয়ে, তাকে নিয়ে কি পথ চলা যায়?

কিছুদূর যেতে না যেতেই হেমাঙ্গিনী অবসন্ন হয়ে পড়লো। তখন একটু আশ্রয়ের জন্যে সে ব্যাকুল হ'ল। কাপড় চোপড় সব টিপ্-টিপিনি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, যেমন আজীবন দুঃখে মানুষের উৎসাহ একেবারে ভিজে যায়। শেষে মাথার চুল থেকে টস্ টস্ ক'রে জল পড়তে লাগলো। কাজলকে অনেক চাপা দিয়েও সে বৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহত রাখতে পারলে না। সে বারম্বার জলে ভিজে, ঠাণ্ডায় কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে আর কিছুতেই ঘুমুতে পারলে না। মায়ের কোলের উপর মাথা তুলে বসে সে জিজ্ঞাসা করলে: মা, কোথায় যাচ্চিস্?

কোথায় আর যাব মা, বল্। আমার কি আর যাবার জায়গা আছে? ভগবান যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাব।

কাজল জায়গাটার পরিচয় ঠিক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে: যেখানে দিদি আছে?

দিদির কথা শোনবামাত্র হেমাঙ্গিনীর রক্ত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললেঃ তোর দিদি মরেচে। তার কাছে যাব কেন? তার চেয়ে যমের বাড়ী যাওয়া ভাল।

'দমের বাড়ী? সে কোথায় মা?' অবোধ বালিকা জিজ্ঞাসা করলে?

'যমের বাড়ীর রাস্তাই যদি চিনবো, তবে আর এখেনে আসতে যাব কেন? পোড়া কপাল! আগে যদি জানতুম, তাহ'লে কি এই নোচ্চা ভাসুরের ভিটে মাড়াই! উচ্ছন্ন যাক্! তেরাত্তিরের ভিতর সেইখানে যাক্, যেখানে তিনি গেছেন!'

মা, আমি দমের বাড়ী যাব? ·· অবোধ বালিকা বড় লোভে বায়না ধরলে।

ছিঃ মা! অমন কথা কি বলতে আছে? তুমি কেন সেখেনে যাবে? শত্তুর যাক্।

থথ্থুর নয়, আমি যাব মা! হাঁ, আমার সেখেনে নিয়ে চল্।

দেখ্ কাজল, অমন কথা বলিস্ নে বলচি। নে ঘুমো, আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে ঘুমো।

আমার ঘুম আত্তে না মা! আমার ভয় কত্তে।

ভয় কি? আমি রইছি যখন, ভয় কি? তুই চোখ বুজিয়ে ঘুমো।

কাজল চোখ বুজল কিনা হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারলে না, তবে সে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে চুপ করলে।

যেতে যেতে হেমাঙ্গিনীর যেন অনুমান হ'ল, পাশেই একখানা চালা-ঘর রয়েছে। অন্ধকারে ভাল ক'রে ঠাহর হ'ল না, তবু মনে হ'ল সেখানা চালাঘর ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আশ্রয়ের একটা বড়ই দরকার, কেন না টিপি টিপি বৃষ্টি হচ্ছিল, এবং কাজলের গায়ের কাপড়-চোপড় একেবারে ভিজে উঠেছিল। শীতে তার গা কাঁপছিল, মায়ের প্রাণ অনুভবে বুঝতে পারলো। কাজেই আশায় আশায় হেমাঙ্গিনী সেই চালাঘরের দিকে গেল।

যিনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেন, তিনি সত্যই এই বাদল-রাতে হেমাঙ্গিনীকে আশ্রয় দিলেন। হেমাঙ্গিনী চালাঘরের কাছে এসে দেখলে, বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ঘরখানি ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ ছিল, কিন্তু তার ছাঁচের তলায় খানিকটা রোয়াক বাঁধান ছিল।

হেমাঙ্গিনী মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই কুঁড়ে ঘরের ছাঁচের তলায় রোয়াকে আশ্রয় নিল। আপনি রোয়াকের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে কাজলকে কোলের উপর শুইয়ে দিল। তার কাপড়-জামাগুলি ভাল ক'রে নিংড়ে তাকে যথাসাধ্য গরম রাখবার চেষ্টা করলো। তারপর নিজে দরমার ঝাঁপের ওপর মাথা রেখে আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করে দিলে।

মাথার উপর পেঁচা ডাকতে লাগলো, আশেপাশে বনের ঝোপে কত রকম শব্দ হ'তে লাগলো। হেমাঙ্গিনীর প্রাণ চমকে চমকে উঠতে লাগলো সে সব শুনে। তবু সে সব সে সহ্য করতে লাগলো অন্য উপায়ের অভাবে। কি করবে সে? আজ যে সে বড়ই বিপন্না!

(৩৯)

প্রায় সমস্ত রাত কাটলো জাগরণে, কাজলকে পাহারা দিয়ে। ঘুম এসে তার চোখকে নিংড়ে, ছুচ ফুটিয়ে ব্যথিত করে তুললো, কিন্তু তবু সে যথাসাধ্য জেগেই বসে রইলো। শেষ রাত্রে কখন ঝিমুনি এসেছে, টের পায় নি। বসে বসেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখে, পৃথিবী আলোতে ভরে গেছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো লোক। একটু পরেই চিনলো, সে সেই কাল সকালের চাষা, যে তার আসবার পথে মাঠের উপর ধান বুনছিল।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে : তুমি না কাল সকালে পথ দিয়ে আসছিলে, মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ?

হেমাঙ্গিনী চোখ রগড়ে বললে : হাঁ বাবা, আমিই !

তা এখেনে বসে আছ কেন ? যেখেনে গেলে, সেখেনে কি কিছু গোলমাল হ'ল ?

কি আর বলবো বাবা, অভাগীর কি কোথায়ও জায়গা মেলে ?

তুমি ত কালির বউ ? পালেদের বাড়ী যাচ্ছিলে ?

হাঁ বাবা।

তারা জায়গা দিলে না ? ...পালমশাইটা কি রকম লোক ?

হেমাঙ্গিনী এ কথার কোনও উত্তর দিলে না, চুপ করে রইলো।

এখন কোথায় যাবে, ঠিক করচো ? বুড়ো আবার জিজ্ঞাসা করলো।

কোথায় আর যাব বাবা? দেখি, ভগবান কোথায় জোটায়!

যেখেনে কালি চাকরি করতো, সেখেনে বাসা নেই?

আছে, কিন্তু সেখেনে যাবার আর ইচ্ছে নেই।

কেন?

সে অনেক কথা, বাবা! কি আর বলবো? সেই দুঃখেই তো এই পোড়া শ্বশুরবাড়ীতে এসেছিলুম।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেও তো বলচো তোমার জায়গা মিললো না?

কই আর মিললো?

তবে? তুমি বউ মানুষ! কোথায় যাবে?

গাছতলায়। তা ছাড়া আর আমার উপায় কি?

তুমি না হয় রইলে গাছতলায়। কিন্তু তোমার সঙ্গে একটি কচি মেয়ে। ও যে গাছতলায় থাকলে মারা পড়বে?

হেমাঙ্গিনীর মনে হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর সত্য ফুটে উঠলো। সেও মনে মনে ভাবলে, তাইতো এ আমি কচ্চি কি!

বুড়ো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ভেবে বললে: তবে এক কাজ কর। যতদিন না যাহ'ক একটা বন্দোবস্ত করতে পার, ততদিন না হয় আমার কুঁড়ে ঘরে থাকবে চলো।

বুড়ো চাষার প্রস্তাবে হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলো। তার মনে হ'ল, সহসা ভগবান বুঝি তার ডাক শুনে তাকে আশ্রয় দেবার জন্যে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। এই বুড়ো চাষালোক, এর মনে এত দয়া? যারা আপনার লোক, তারা তার অবস্থার কথা ভাবলে না, আর এই পর-লোক,—যার সঙ্গে তার কখনও কোনও আলাপ পরিচয় নেই,—

সে অযাচিতভাবে তাকে আশ্রয় দান করতে নিজ হতে প্রস্তাব কচ্চে! পৃথিবীতে তাহ'লে এখনও ভগবানের দূত আছে! পৃথিবী একেবারে নির্ম্মম লোকে ভরাট নয়!

হেমাঙ্গিনীকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বুড়ো বললে: কি ভাবচো? আমার কুঁড়ে ঘরে যেতে মন সরচে না?

হেমাঙ্গিনী এ কথার সোজা উত্তর না দিয়ে বললে: বাবা, তুমি কি ভগবান?

বুড়ো একটু হেসে বললে: দূর বেটি! ভগবান কেন হতে যাবো? আমি ত চাষা। চাসা কি কখনও ভগবান হতে পারে?

হেমাঙ্গিনী গলায় আঁচল দিয়ে বললে: তুমিই ভগবান। তা না হ'লে এ বিপদের সময়, নিজে যেচে কে আমায় আশ্রয় দিত? দুখিনীর দুঃখ কে বুঝতো বাবা?

যাক্ ও সব কথা। এখন চলো, তোমাকে সঙ্গে ক'রে আমার তালপাতার ঘরে রেখে আসি। সেখেনে এক বুড়ী আছে, সে তোমায় আপনার লোকের মত দেখবে। সে মানুষ বড় ভালবাসে।

কে, আমার মা বুঝি?

মা কি মেয়ে তা জানি না, তবে মানুষটা ভাল। কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না। খায় দায় কাঁশি বাজায়, কারুর কথার মধ্যে থাকে না।

তোমাকে আগে একটা নমস্কার করি, বাবা!...ব'লে হেমাঙ্গিনী হাঁটুর ওপর বসে গলায় কাপড় দিয়ে বুড়ো চাষার পায়ে একটা নমস্কার করলে।

থাক্ থাক্, করো কি ?......ব'লে বুড়ো একটু হটে গেল।

নাও চলো। আর দেরী করো না। মেয়েটার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আহা, ছেলেমানুষ! সমস্ত রাত এইখেনেই বুঝি পড়ে আছে ?

হাঁ বাবা, সমস্ত রাত এই ছাচের তলায় আমরা দু'টি প্রাণী!

আহা-হা! এমন কচি মেয়েকে সমস্ত রাত ঠাণ্ডা লাগায় ? মারা পড়বে যে ?...নে, আয় খুকি, আমার কোলে আয়। আমাদের বাড়ীতে গিয়ে মুড়ি মুড়কি বাতাসা খাবি তো ?

বুড়ো কাজলকে কোলে তুলে নিল। কাজল প্রথমে তার কোলে যেতে চাইছিল না, কিন্তু বুড়ো এমন আদর করে তাকে ভুলিয়ে নিল যে কাজল যেন সত্যি তার ঠাকুরদাদার কোলে উঠেছে।

(৪৩)

কই গো বড়-বৌ ?

নেপথ্য থেকে কে উত্তর দিল : তুমি যে যেতে যেতে ফিরে এলে গা ?

এই বেরিয়ে এসে দেখ, তোমার জন্যে কাদের নিয়ে এসেছি।

একখানা লালপেড়ে শাড়ি-কাপড়-পরা বুড়ী মেয়েমানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে : কই কাদের আবার নিয়ে এলে ?

বুড়ো হেমাঙ্গিনী আর তার মেয়েকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে : এদের চেনো ?

বুড়ী ঘরের দাওয়া থেকে নজর বাড়িয়ে দেখলো। দেখে বললে : তাইতো! এঁদের ত চিনতে পারছি নে!

কালির বউ আর মেয়ে! ··· কালি গো! পালেদের মেজ ভাই! ছেলেবেলায় কতো আমাদেব বাড়ীতে আসতো, মনে নেই?

কালি? খুব মনে আছে। এই পেয়ারা গাছটাতে যতো কেশো পেয়ারা, তার জন্যে থাকবার যো ছিল না। ওঃ! তার বউ!...এসো এসো মা লক্ষ্মী! আজ আমার কি ভাগ্যি! আর এটি কে? তার মেয়ে? দাও, দাও আমার কোলে দাও।

হ্যাঁঃ! তোমার কোলে দিই, আর তুমি ওকে জড়িয়ে ত্রুম করে মাটিতে আছাড় খাও! তার চেয়ে এক কাজ করো! দুটি মুড়ি আর খানকতক বাতাসা ওকে আগে এনে দাও দেখি!

বুড়ী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা চুবড়িতে গোটাকত মুড়ি আর খানকতো বাতাসা নিয়ে এসে, কাজলের হাতে দিল। মুখে বললে: বাঃ; বেশ পদ্মফুলের মত মেয়েটি তো!

হেমাঙ্গিনী এগিয়ে গিয়ে বুড়ীর পায়ে নমস্কার করে বললে: মা? আমি তোমার মেয়ে!

বুড়ী হেমাঙ্গিনীকে হাতে ধরে তুলে, তার চিবুকে একটা চুমু খেয়ে বললে: বাঃ লক্ষ্মী বউটি! তা, তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই দেখচি? কালি কি তাহ'লে আর নেই?

হেমাঙ্গিনী প্রশ্ন শুনে ঘাড় নত করলে। বুড়ো মাঝে থেকে বললে: হাঁ, ওর কপাল পুড়েচে। কালি যখন চাকরি করতো, তখন বোধ হয় ও খুব সুখেই ছিল, এখন পড়েছে বড় মুস্কিলে! ... থাক্, সে সব কথা পরে হবে'খন! এখন ওদের যাতে কষ্ট না হয়, তার বেবস্থা করো। আমি মাঠে চললুম। ধান গাছগুলো না নেড়ে দিলে, সোম-বছর খাব কি?

বুড়ী বললে : আহা, কালির বউকে যত্ন করবো না তো কর্ব্ব কাকে ? সে কি আমার পর ছেলে গা ? সে যে আমার পোলার মত ছেলে !—আহা ! সে আমার নেই ! আমরা রইলাম, আর সে চলে গেল ? বলতে বলতে বুড়ী কাপড়ে চোখ মুছতে লাগলো।

তা যাক্ ! এখন শ্বাশুড়ি বউয়ে যা হয় বোঝা-পড়া করো। যে গেছে, তার জন্যে ত কেঁদে আর লাভ নেই ! আমি চললুম, আমার দুঃখের ধান্দায় !

বুড়ো মাঠে চলে গেল। হেমাঙ্গিনী বুড়ীর কাছে বসে নানান্ দুঃখের কথা নামাতে লাগলো।

(৪৯)

পালমশাই ঘরে বসে বসেই শুনলে, তার ভাদ্র-বৌ পরাণে মণ্ডলের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। তখন যত রাগ গিয়ে পড়লো তার, হতভাগা পরাণে মণ্ডলের ওপরে। সে বুড়ো হয়েছে, অথচ এখনও তার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু হ'ল না, এজন্যে অনেকবার পালমশাই আক্ষেপ করলে। তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে,. মণ্ডলের পো'কে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দেবে।

গণুকে ডেকে পালমশাই বললে : শুনেছ গণু, বেটাচ্ছেলে পরাণে মণ্ডলের কাণ্ড !

কি কর্লে সে ?

কি কর্লে সে? যা কর্ব্বার নয়, তাই করলে! আমি দিলুম আমার বাড়ীর বউকে তাড়িয়ে, সে কি না তাকে জায়গা দেয়! এত তার বুকের পাটা! একবার বুঝে দেখলে না যে কেন আমি তাকে তাড়িয়ে দিলুম?

ঐ রকম সব। পোড়া কপাল মিনষের! তোর এত মাথা-ব্যথা কিসের বাপু, যে তুই আমাদের বাড়ীর বউকে জায়গা দিস্?

পালমশাই হাতের হুঁকোতে একটা টান মেরে বললে: দাঁড়াও না, বেটাকে বেশ করে জব্দ করে দিচ্চি! ওটাকে আমি একঘরে কর্ব্বো, তবে ছাড়বো।

গণু মুখে একটা সাজা পান দিয়ে বললে: দেখো, আবার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়!

পালমশাই রেগে উঠে বললে: কিসের সাপ বেরুবে! সাপ আবার কিসের? আমার নামে কোন্ বেটা কি দোষ দেয়? আমি আর পরাণে মণ্ডল? কিসে আর কিসে!

গণু আর কিছু বললে না। শুধু পালমশাইকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, পরাণকে একঘরে করতে গেলে নিজে না সমাজের কাছে ধরা পড়ে যায়। মেয়েমানুষ সাধারণতঃ চতুর জাতি, কথাটা একটু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েই আবার চাপা দিল।

পালমশাই পাড়ার মধ্যে প্রচার কর্ত্তে লাগল যে তার ভাদ্র-বৌয়ের স্বভাব-চরিত্তির ভাল ছিল না, তাই তারে ঘরে জায়গা দেয় নি। কথাটা পাঁচজনে শুনলে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করলে না; তার কারণ, যে বলচে, সেও যে খুব খাঁটি সচ্চরিত্র, তা তো নয়! একটা ডোমের ঘরের মেয়েকে

যে সে আপনার বাড়ীর মধ্যে রেখে, রাত্রে নিজের ঘরে নিয়ে শোয়, এ কথাটা পাড়ার ষোল আনা লোকই জানতো।

কাজেই পাল মশাই আপাততঃ পরাণে মণ্ডলের বিশেষ কিছুই কর্ত্তে পারলে না। যখন তাকে একঘরে কর্ব্বার বিশেষ কিছুই সুবিধা হ'ল না, তখন পালমশাই নিজের হাত নিজে কামড়ে শুধু সুবিধা খুঁজতে লাগলো।

একদিন একটা খবর পেয়ে পালমশাই লাফিয়ে উঠলো। গণু একদিন বললে: আর একটা কাণ্ড ঘটেছেঁ, তা বুঝি শোন নি তুমি ?

কি কাণ্ড গা ? আমায় সব বলো না কেন ? তুমিও যদি পর হও, তাহ'লে আমি দাঁড়াই কার কাছে ?

গণু চারিদিক চেয়ে চুপি চুপি বললে: তোমার নাকি একটা সেয়ানা ভাই-ঝি ছিল ? কি, নয়না না কি নামটা তার ?

হাঁ, হাঁ, কালির নয়না ব'লে একটা মেয়ে ছিল বটে! সেটাকে তো এখেনে আনে নি ওর মা মাগী! সেটাকে রেখে এলো কোথায় বলতে পারো ?

তার কথাই তো বলচি। সে মেয়েটা মা'র সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নাকি বেরিয়ে গেছে! একটা হিন্দুস্থানী ছোঁড়ার সঙ্গে নাকি সে ভিড়ে পড়েছে।

সত্যি নাকি ? কই, এতদিন ত আমায় এ কথা বলো নি ?

ভাবছিলুম, তোমায় বলবো, তুমি বিশ্বাস কর্ব্বে কি না ? হাজার হোক, নিজের ভাই-ঝি ত বটে!

পালমশাই হাত মুখ নেড়ে বললে: ভাই-ঝি ? ভাই-ঝি ত কি

হয়েছে ? সে যখন কুল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, তখন আবার তার ওপর আমার টান কি ? ... আচ্ছা তুমি এ কথাটা কোথায় শুনলে ?

শুনিচি আমি অনেক কৌশলে। তোমার ভাদ্দরবৌ যেদিন এখেনে আসে সেদিন ছোট বউয়ের কাছে বসে মাগী নিজে গল্প কচ্ছিল মেয়ের কথা ! আমি আড়াল থেকে আড়ি পেতে একথা শুনলুম।

এঃ ! এত বড় খবরটা আমায় এঁত দিন বলোনি ? মাগীকে একবার দেখিয়ে দিতুম মজা, ও কেমন ক'রে এই গাঁয়ে থাকে !

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে পালমশাই উঠলো। উঠেই একেবারে গাঁয়ের মোড়লের বাড়ী গিয়ে হাজির।

(৪২)

দোগাছি গাঁয়ের মোড়ল ছিলেন শ্রীমন্ত কড়ুই।

অপরাহ্নে দিবানিদ্রা সেরে এক ছিলিম তামাক টানতে টানতে তিনি তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে খাতকদের সুদের হিসাব কষছিলেন। খেরো দিয়ে বাঁধানো লম্বা খাতাখানা অনেক লোকের সর্ব্বস্ব মুটোর মধ্যে নিয়ে নরমেধ যজ্ঞের পুঁথির মত কড়ুই মশাইয়ের দৃষ্টিপাতের অপেক্ষা কচ্ছিল।

কড়ুই মশাইয়ের সুদের ব্যবসা ছিল। গ্রামের বহু লোক তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিত অসম্ভব সুদে, এবং ঋণ শোধ দিতে না পারলেই তাঁর জবাই-করা ছোরার তলায় আপনাদের সর্ব্বস্ব বলিদান দিত। এই ক'রে কড়ুই মশাইয়ের যথেষ্ট প্রভাব জম্মে গ্রামের মধ্যে। আফগান

দেশের লোক যে নীতির জোরে দূর বাংলা দেশে এসে বিনা বিত্তায়, বিনা বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে, কড়ুই মশাই সেই নীতির জোরে এখন গ্রামের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রকাণ্ড মাথা।

পালমশাইকে আসতে দেখে কড়ুই মশাই স্থদের অঙ্ক কষা আপাততঃ মুলতুবি রেখে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি পালমশাই ? গ্রামের খবর কি ?

পালমশাই একটা সভক্তি নমস্কার সেরে, হাত দুটো জোড় করে বললে ঃ খবর-টবর তো সবই আপনার কাছে ! আপনার অজানত আর কি আছে ?...তবে কি জানেন, আপনি থাকতে গ্রামে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে যায়, এইটেই বড় দুঃখের বিষয়।

কি কাণ্ড আবার ঘটে গেল, পালমশাই ?

আজ্ঞে, নিবেদন কর্ব্ব ? আপনি অভয় দেন ত নিবেদন করি !

বলুন, বলুন, শুনি।

আজ্ঞে, ঐ পরাণে মণ্ডল। তার এত বড় আস্পর্দ্ধা, সে একটা বেশ্যা মাগীকে বাড়ীর মধ্যে এনে রাখে ?

বেশ্যা মাগী ?... ও বুঝিচি ! তা, সেতো আপনারই ভাদ্রবৌ হয় পালমশাই।?

আমার ভাদ্রবৌ ব'লে কি বেশ্যা হ'তে পারে না ? সেটা বেশ্যা, আমি খুবই জানি। আমার বাড়ীতে একদিন থেকে যে কাণ্ড করেছে, তা সে আপনাকে বলবার কথা নয় ! ঘরের কথা ত সব বলা যায় না !... আচ্ছা, যাক্ ! তাই না হয় হ'ল ! ধরলুম, সে মাগী বেশ্যা নয় ! কেননা, আমি ছাড়া আর কেউ তাকে বেলেল্লাগিরি করতে দেখে নি !...

আচ্ছা যাক্! কিন্তু আর একটা কথা বলি! তার একটা মেয়ে যে বাজারে বেরিয়ে গিয়ে, সব লোকের চোখের সুমুখে, একটা মেড়ো খোট্টার সঙ্গে ঘরবসত কচ্চে,—এটাতো আর মিথ্যে নয়? একথা তো মাগী নিজেই আমার ছোট বউমার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছে! আপনি বলেন, আমি ছোট বউমা'কে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে পারি!

মোড়ল মশাই চক্ষু তুলে বললেন: আপনার ভাদ্রবৌয়ের মেয়ে? অর্থাৎ, আপনার ভাই-ঝি?

পালমশাই উৎসাহ ভরে বললে: হাঁ, হাঁ, আমার এক সোমত্থ ভাই-ঝি! তাকে মাগী কাকনাড়ায় রেখে এসেছে! সেখেনে দিব্বি ব্যবসা চালাচ্চে! কলের আঁকাড়া পয়সা, ভাবনা তো নেই! হুঁদো হুঁদো হোঁত্‌কা মেড়োগুলো আসচে, আর ঝনাৎ ঝনাৎ ক'রে টাকা ফেলচে! একটা মেড়ো ছোড়া নাকি তার সোয়ামী হয়েছে! আর তার আওতায় ছুঁড়ি দিব্বি পয়সা কামাচ্চে!

এত বড় ব্যভিচারের কথা শুনলে কোন্ সমাজপতির না রাগ হয়? কড়ুই মশাইও চটে উঠলেন পালমশায়ের বিবৃতি শুনে। তিনি বললেন: বলেন কি, পালমশাই, আপনার ভাইঝি হয়ে তার এত বড় বুকের পাটা?

কি কর্ব্ব বলুন! আমার-ত বাধ্য নয়। আর আমার বাড়ীতেও সে থাকতো না। তার মা একদিন থাকতে এসেছিল, তাকেও তো তাড়িয়ে দিয়েছি সমাজের ভয়ে!... কিন্তু সাহস দেখুন ঐ পরাণে মণ্ডলের! এত বড় আস্পর্দ্ধা তার, আমি তাড়িয়ে দিলুম আমার ভাদ্রবৌকে, আর সে কিনা তাকে ঘরে যায়গা দেয়! এতে সমাজের ভয় কর্ব্বে কি করে

লোকে? এতে বেশ্যাদের যে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আপনিই বলুন না, হবে না কি? সমাজের বুকের ওপর বসে থাকবে একটা বাজারে বেশ্যার মা?

আপনি কর্ত্তে চাইচেন কি?

আমি চাইবো কেন? আপনারাই চাইবেন! আপনি সমাজের মাথা। আপনিই ত কর্ব্বেন!...আমি বলি, বেশ্যার মাকে একঘরে করা হোক্। আর যে তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কচ্চে, তাকেও সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক্!

মোড়ল শুনে খানিকটা ঘাড় নাড়লেন, তারপর বললেন : আপনি কথা ঠিকই বলচেন পালমশাই, কিন্তু এইটে আমি বুঝে উঠতে পাচ্চিনে যে, মেয়ে সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি কচ্চে বলে তার মায়ের কি দোষ হতে পারে? মেয়ে ত আর মায়ের সংসারে একত্র থাকে না!

থাকে না? থাকে বই কি! এতদিন ত একসঙ্গেই ছিল।

সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন ত নেই। এ গেরামে এসে সে মেয়ে ত মায়ের সঙ্গে বাস কচ্চে না।

কভুই মশাই, আপনি পণ্ডিত লোক,—এটা বুঝতে পাচ্চেন না যে, যখন তারা একসঙ্গে ছিল, তখন ত মা মেয়ের হাতের রান্না খেয়েচে। তাহ'লেই ত তার জাত গেছে।

মোড়ল আবার খানিকক্ষণ মাথা নাড়লেন। তাঁর অনেক দিনের জমা-করা পাণ্ডিত্যটুকু মাথা থেকে নাড়া দিয়ে বার ক'রে বললেন : হাঁ, এ একটা কথা আপনি বলচেন বটে! আচ্ছা তাহ'লে পরাণে মণ্ডলকে

একঘরে কর্ত্তেই হবে। কিন্তু আপনাকে এর জন্য একটা বড় রকম ভোজ দিতে হবে গেরামের সব লোককে!

হাঁ, তা দিতে হ'বে বৈ কি! খরচ পত্র যা কর্ত্তে হয় তা সব আমায় কর্ত্তে হবে বৈ কি! তবে ওর ভেতর যাতে একটু কমে জমে হয়, তা একটু আপনাকে করে দিতে হবে! আমি আসচে রথ-যাত্রার দিন সমস্ত গ্রামের লোককে নেমন্তন্ন করে চিঁড়ে-দই ফলার করিয়ে দেবো।

মোড়ল মশাই তাঁর সার্ব্বভৌম উদারতা প্রকাশ করে বললেন: শুধু এই গ্রামের লোককে খাওয়ালে কি হবে? আশ-পাশের পাঁচখানা গ্রামের লোকদেরও তো জানান চাই!

পালমশাইয়ের ট্যাঁকে একটু টান পড়লো। পরাণে মণ্ডল ও তার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীকে জব্দ কর্ব্বার জন্য তিনি খরচ কর্ত্তে রাজি আছেন বটে, কিন্তু তাব'লে পাঁচখানা গ্রাম খাওয়ান! এত বড় মহাযজ্ঞ তিনি কেমন ক'রে করেন? কিন্তু তবু অপমানের প্রতিশোধ ত নেওয়া চাই! একটা স্বামীপুত্রহীন মেয়েমানুষ বিশেষ তার নিজের ভাইয়ের বউ যে তাকে অপমান ক'রে গ্রামের মধ্যে অপর এক লোকের বাড়ীতে নির্ব্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করবে, এটাই বা কেমন ক'রে তাঁর সহ্য হয়? সুতরাং যা করে হোক্, ব্যবস্থা কর্ত্তেই হবে! পালমশাই মোড়লের অনেক হাতে পায়ে ধরলো; শেষে পাঁচ টাকা ব্যক্তিগত সেলামি দিয়ে, মোড়ল মশাইকে অনেক ক'রে নরম ক'রে খানদুই গ্রামের লোককে খাওয়াবার পরওয়ানা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

(৪৩)

রথযাত্রার দিন, পালমশাইয়ের বাহিরের প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড এক শামিয়ানা সহিংস গৌরবে গ্রামের লোককে চঞ্চল করে তুললো। গ্রামের যত মুরুব্বিরা এসে স্থান পরিগ্রহ করলেন সভাগৃহের মাঝখানে। মাথার উপরে লাল নীল কাগজের মালা দুলতে লাগলো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কলরব তুলে সভার গুরুত্ব আরও পরিবর্দ্ধিত করতে লাগলো।

দু-গ্রামের সব লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কেবল বাদ গেল পরাণ মণ্ডল। বেচারী বাড়ীতে বসে শুনলো, তাকে এক ঘরে কর্ব্বার জন্যই আজকে গ্রামে এই মহোৎসব; আর পালমশাই তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

পরাণ হেমাঙ্গিনীকে ডেকে বললে : মা, সব শুনেচ ?

হেমাঙ্গিনী বললে : শুনেচি বই কি, বাবা! আমার জন্যই তোমার আজ এই শাস্তি! আমাকে অনুমতি দাও, আমি এখান থেকে চলে গিয়ে, অন্য কোন দূর গ্রামে গিয়ে থাকি!

আর কোথায় থাকবে, মা ? তোমার ত যাবার আর কোনও জায়গা নেই! তুমি যে সত্যিই বড় দুঃখী!

হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদ করে বললে : কেন, রাস্তা আছে, মাঠ আছে। সেখেনে থাকলে ত পালমশাই শাস্তি দিতে পার্ব্বে না।

পরাণ দৃঢ়কণ্ঠে বললে : না মা, তা হবে না। আমি বেঁচে থাকতে তোমায় রাস্তায় কি মাঠে যেতে দেবো না! তুমি যে আমায় বাবা বলেচো,

আমিও যে তোমায় মা ব'লে ডেকেচি। আমার মা রাস্তায় দিন কাটাবে, আর আমি ঘরের মধ্যে সমাজকে নিয়ে থাকবো? আমি কি এত বড় পাষণ্ড?

কিন্তু তোমায়ও যদি রাস্তায় দাঁড় করায় ওরা?

পরাণ সাহসে ভর ক'রে বললে: না, তা পারবে না, মা! এ যে কোম্পানীর মুলুক! এখেনে অতো সহজে রাস্তায় দাঁড় করাতে পারে কেউ? আমি মাঠে লাঙ্গল ঠেলবো, পেটের ভাত চালাবো! আমার জমি থেকে আমায় বঞ্চিত করে কে?

গ্রামশুদ্ধ লোক পেছনে লাগলে, তোমায় কোথা থেকে কি মকদ্দমা ক'রে জমি-জায়গা কেড়ে নেবে, কে বলতে পারে?

জমি কেড়ে নেয়, ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মজুরি করবো। তবু তোমায় আমি ছাড়বো না। কেন না, তোমায় আমি আশ্রয় দিয়েছি। আমার নিজের গণ্ডা বোঝবার জন্যে সে আশ্রয় কি ফিরিয়ে নেওয়া যায় মা?

হেমাঙ্গিনী সকৃতজ্ঞ ভাবে বললে: তাব'লে আমার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার কর্ব্বে তুমি?

তা কর্ত্তে হবে বৈ কি! আমার নিজের মেয়ে হলে কি আমি তাকে ছাড়তে পারতুম?

হেমাঙ্গিনী মনে মনে পরাণ মণ্ডলকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। তার মনে হ'ল, পৃথিবীতে সত্যিই বুঝি ভগবান এসেছেন, তাকে রক্ষা করতে! এ তার পাতানো বাবা নয়, সত্যিই তার পিতা। তা না হ'লে এত স্নেহ তার ওপরে, এত স্বার্থত্যাগ! এ কি বাঙ্গালা দেশের লাঙ্গল-ঠেলা চাষা, না কোন্ দেবতা এসেছেন তাকে ছলনা করতে?

কোথায় তার আপনার লোক, আপনার ভাসুর, পালমশাই,—আর কোথায় না-জানা না-শুনো এক পর-লোক! ভাসুর তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল, তার সর্ব্বনাশ করতে গেল, তাকে সমাজে বেশ্যার মা ব'লে বাহাল করলো, গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপ করণ-কারণ বন্দ করে দিল,—আর এই মহাত্মা তাঁর সামান্য শক্তি দিয়ে প্রাণপণে তাকে দুষমন্ ভাসুরের হিংসা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো। পৃথিবীতে এমন ভাসুরও আছে, আবার এমন পরাণ মণ্ডলও আছে।

হেমাঙ্গিনী ধপ্ করে পরাণের পায়ের ওপর পড়ে বললে: বাবা? সত্যিই তুমি আমার বাপ! তুমি দেবতা, মানুষ নও!

পরাণ হেমাঙ্গিনীর হাত দুটো ধরে তুলে বললে: দুর ক্ষেপি, দেবতা হতে কি আমরা পারি? আমরা যে চাষা, সেই চাষা! আমাদের সকলেই অচ্ছেদ্দা করে। তা না হলে দেখছিস্ নে, গেরাম শুদ্ধু লোক আমাকে যাচ্ছে-তাই কচ্চে!

তারা মানুষ চেনে নি, বাবা! তাই তোমার মত লোককে একঘরে কর্ত্তে চায়!

শাস্তি দেবে বৈ কি, তা না হ'লে ঠাকুরের কাছে আমার যাচাই হবে কেমন করে?

বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।

পরাণ একগাল হেঁসে বললে: এই ঘাটের মড়া আর মঙ্গল নিয়ে কি করবে, মা? আমার ষাট্ পেরিয়েছে, আর ক'দিনই বা বাঁচবো? যে ক'দিন বাঁচি, ঠাকুরের কাছে মানত্ করি, যেন তোরই মঙ্গল হোক্।

(৪৪)

একঘরে ত হ'লই, আবার নানা উপায়ে পালমশাই চেষ্টা করতে লাগলো, পরাণের ওপর অত্যাচার করতে।

পরাণ কোনটাই গায়ে মাখে না, কাজেই কেবলই পিছলে যেতে লাগলো পালমশাইয়ের হাত থেকে! তার জন্যে পালমশায়ের বড় আপশোষ! সে কেবলই গণুর কাছে দুঃখু করে যে ও বেটাকে জব্দ করতে পারলুম না।

গণু বললে : ও বুড়োকে জব্দ করে কি হবে? তার চেয়ে তোমার ঢেঁকিকে সায়েস্তা করো।

কাকে, মেজ বৌকে? আরে ঐ গুয়োটাই তো ওকে ছাড়চে না! তা না হ'লে কি মেজবৌ এতদিন আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়তো না!

সে লুটিয়ে পড়ে কি হবে? ......তার ওপর দেখচি তোমার এখনও টাঁক আছে?

হেঁ, হেঁ, কি বলো যে গণু, তার ঠিক নেই! তোমার যত সব কুছিষ্টি কথা।

আমায় নিয়ে এখন আর বুঝি তেমন ভাল লাগচে না? না? আমি বুঝি পুরোণো হয়ে গিছি?

হেঁ, হেঁ, কি যে বলো, কি যে বলো? তোমাদের মন বড় খারাপ!

আমার মন ত খুব খারাপ! তোমার মনই বা ভাল কি? ঐ বুড়ী মেয়েমানুষটার জন্যেই বা তুমি এত পাগল কেন?

পাগল কেন, পাগল কেন? তবে কি জানি, ঘরের বউ, এই যা।

ঘরের বউ ব'লে ত ভারি সমীহ করেছিলে? রাত বারোটার সময় তার ঘরে টোকা মেরে,—যাক্। আচ্ছা, দেখি কেমন করে তুমি ওকে হাতের মধ্যে আনো! আমিও গণ্ড ডুম্নি! এক কথায় তোমায় আমার ধর্ম্ম দিয়েচি! এখন ভেবেচ তুমি আর একজনকে নিয়ে থাকবে, আর আমি ভেসে যাব?

পালমশাই নিতান্ত নিরপরাধীর মতই বললো: না, না, না গণু! তুমি ওসব কি কথা বলচো, ওসব কি কথা বলচো? ......বলতে বলতেই পালমশাই সেখান থেকে সরে গেল।

তার পর থেকেই দেখা গেল, পালমশাইয়ের প্রাণপণ চেষ্টা অনেকটা কম হয়ে এলো। পালমশাই যে মতলবই করে, গণ্ড তাতে বাধা দেয়। গণুর মন রাখতে পালমশাইকে উটানে গা ভাসাতে হয়।

কাজেই ফলতঃ পরাণের ওপর অত্যাচারটা অনেকটা সুসহ হয়ে এলো। পরাণ একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

(৪৩)

এইভাবে বছর আষ্টেক কাটলো।

কাজল এই আট বছরে বেশ বড় হয়ে উঠলো। তার শরীরে প্রথম যৌবন এসে পুরোমাত্রায় দেখা দিল। মুখখানি তার ক্রমশঃ গোল হয়ে উঠলো। হাত পা-গুলি বয়সের রসে টলটল করতে লাগলো। মাথার

খোঁপা নিদাঘকালের মধুচক্রের মত পাড়ার পুরুষ-ভ্রমরদিগের লালসার জিনিষ হয়ে উঠলো। চ'খে বাঁকা চাহনি অজ্ঞাত ভাবেই যৌবনের কলা-শিল্প আরম্ভ করে দিল। পরাণ ও হেমাঙ্গিনী তার বিয়ে না দিয়ে আর থাকতে পারে না।

পরাণ যখনই ফুরসত্ পায়, পালমশাইয়ের কুটুম্বদের খোঁজ-খবর নিয়ে কাজলের বিয়ের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর নামে কুটুম-মহলে এমন একটা কুৎসা রটে গিয়েছিল যে, পরাণ কিছুতেই সে দিকে সুবিধা করতে পারছিল না। যদিবা কোথায়ও একটু সুবিধা হয়, পালমশাইয়ের কাণের পেছনে অমনি শ্যেণ দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তাঁর চক্রান্তে সম্বন্ধটি অমনি পাথরের ঘায়ে কাচের মত চুরমার হয়ে যায়।

বড় বিপত্তি। পরাণ তার সামান্য শক্তি দিয়ে পালমশাইয়ের দৈত্য-শক্তিকে পরাভূত করতে পারে না। তার পরিশ্রমটুকুই সার হয়। সে দুর্ব্বলের মনোভাব নিয়ে ব্যথিত অন্তঃকরণে বাড়ী ফিরে আসে। হেমাঙ্গিনীকে বলে : মা ? তোমার ভাসুর তোমার মেয়ের বিয়ে হতে দেবে না। বড় শত্তুরতা কচ্চে।

হেমাঙ্গিনী শুনে বলে : আমার কপাল ! লোকে নিজে হতে কত চেষ্টা ক'রে মরা ভাইয়ের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে, আর আমার ভাগ্যি এমন যে, যার কাজ সেই বাগ্ড়া দিচ্চে ! এ অনাথার ওপর কেন যে তিনি এমন বিমুখ, বুঝতে পারিনে।

পরাণ বলে : মা ? ও এক একটা লোকের এমন স্বভাব থাকে যে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে ! তাঁর ভাইঝির বিয়ে না হ'লে যে তাঁরই বাপপিতেমহ নরকে পচতে থাকবেন, এ তাঁর জ্ঞান নেই !

আচ্ছা, লোকেও তাঁকে কিছু বলে না ?

কারুকে কি জানতে দেয় যে, সেই সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিচ্চে। এমন ভাবে অপর লোক দিয়ে কুটুম্বদের কাছে ভাংচি দেয় যে, কার সাধ্যি জানতে পারে যে তিনিই এর মূল। লোকে ত অতো সন্ধান নেয় না, আর কারই বা এতো মাথাব্যথা পড়েছে যে, এই নিয়ে হাঙ্গামা করে !

হেমাঙ্গিনী নিরাশ হয়ে বলে : তবে কি হবে বাবা ?

কি আর হবে ? ঠাকুরের ওপর নির্ভর করো ! তিনিই হয়তো এক দিন মুখ তুলে চাইবেন !

মুখ তুলে কবে যে ঠাকুর চাইবেন, হেমাঙ্গিনী তাই বসে বসে ভাবে। এদিকে কাজল বেশ বড় হয়ে উঠতে লাগলো। তার দিকে তাকালেই হেমাঙ্গিনীর মনে পড়তে লাগলো নয়নতারার কথা। তারতো অনেক দিন বিয়ে না হওয়াতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সময়ে বিয়ে হ'লে, শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে কি নয়না এক হিন্দুস্থানীকে এমন ক'রে প্রশ্রয় দিত ? না, আজ তার মায়ের জীবনে এমন অসহ্য শাস্তি চিরদিনের তরে লেগে থাক্তো ? গ্রামের লোক যে তাকে একঘরে করেছে, সে তো ঐ নয়নার কাণ্ডকারখানার অছিলাতেই। নইলে তার ভাসুর কি তার এত সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারতো ?

কাজলের বিয়ের সম্বন্ধ যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে যেতে লাগলো, হেমাঙ্গিনীর রাগ তত গিয়ে পড়তে লাগলো নয়নতারার ওপরে। সে মনে মনে তাকে অভিশাপ দিতে লাগলো, মায়ের স্নেহ যতটা অভিশাপ দিতে পারে ! একদিকে তার ওপর ফল্গুনদীর প্রবাহের মত চাপা স্নেহ, অপর দিকে দুঃখ কষ্টের রাগ ! বিপরীত মনোবৃত্তির দুরন্ত ধাক্কায় তার মস্তিষ্কের

বালুতট ধ্বসে ধ্বসে পড়তে লাগলো। সে রাত্রে নিদ্রা যায় না, দিনে গৃহস্থালী কাজ গুছিয়ে করতে পারে না। যত পরাণ মণ্ডল ঘুরে ঘুরে এসে হেমাঙ্গিনীকে বিফলতার সংবাদ দেয়, হেমাঙ্গিনী তত অস্থির হয়ে পড়ে। নয়নকে স্থমুখে না পেয়ে আড়ালে বসে তাকে গালাগালি দেয়, আর নিজের কপাল চাপড়ায়। পরাণ মণ্ডল আর তার স্ত্রী চিন্তিত হ'য়ে পড়লো তার জন্যে। মেয়েটা পাগল হয়ে না যায়!

পরাণ প্রাণপণে উঠে পড়ে লাগলো, যাহ'ক ক'রে কাজলের বিয়ে দেবার জন্যে। সে তার শক্তির অধিক পণ দিতে প্রস্তুত হ'ল। চাষের জমি বাঁধা দিয়ে সে টাকা যোগাড় করলো।

অনেক জায়গায় অকৃতকাম হয়ে শেষে এক জায়গায় বুঝি তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবার মত হ'ল। অনেক টাকা পণের প্রলোভনে এক ঘর চাষা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে স্বীকার করলে। পরাণ হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে!

বাড়ীতে ফিরে হেমাঙ্গিনীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললে: মা? কেউ যেন শুনতে না পায়, খবরদার খবরদার, এক জায়গায় তোমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেচি। আসচে বুধবারে বিয়ের দিন ঠিক করে এলুম।

কারও জীবনসঞ্চিত আশা ফলবতী হতে চললে, সে যতোটা আহ্লাদিত হতে পারে, ঠিক ততটা আহ্লাদ মনে মনে অনুভব করে হেমাঙ্গিনী বললে: সত্যি বাবা, সত্যি ঠিক করেচো? সত্যি আমার কাজলের বিয়ে হবে?

পরাণ চারিদিক চেয়ে বললে: চুপ্ চুপ্, অত জোরে কথা বললে

তোমার গুণধর ভাসুর কোথা থেকে শুনে ফেলবে, আর সব ভেস্তে দেবে!

হেমাঙ্গিনী ভয় পেয়ে খুব চাপা গলায় বললেঃ না, বাবা! আমি আর চেঁচিয়ে কথা কইবো না! কিন্তু তুমি সত্যি বলো, আমাকে ভোলাবার জন্যে স্তোকবাক্যি দিচ্চ না তো?

—আরে, নারে বেটি, না! এবার যা সম্বন্ধ করেচি, এ আর ভাঙ্গবার নয়। তবে ছেলেটি তেমন ভাল নয়! চাষ বাস ক'রে খায়! লেখা পড়া কিছু জানে না।

—তা হ'ক, তা হ'ক। ও খুব ভাল পাত্তর! এই বুধবারেই দিয়ে দাও!

– আরও বলি, ছেলেটা আবার চোখে একটু দেখে কম! বেরি বেরি না কি ব্যামো আছে, তাই হয়ে চোখ দু'টো নষ্ট হয়ে গেছে!

—চোখ্ নেই?...হেমাঙ্গিনী প্রথমটা একটু বিমর্ষ হলো, কিন্তু মুহুর্ত্ত পরেই বললেঃ তা হোক গে। পুরুষ মানুষের চোখ নাইবা রইলো! চাষ বাস করে খায়,তাতে ত আর চোখের দরকার হবে না! হাতে জমি চষবে!

—হাঁ, সেটা তুমি বুঝে দেখো। শেষকালে আবার আমায় দোষ দিও না। আমি তোমায় সব খুলেই বলচি।

—তোমার মত আছে ত বাবা? তাহ'লেই আমার মত! তা ছাড়া আর পাত্তর পাওয়া যাচ্চে কই?

পরাণ ঘাড় নেড়ে বললেঃ পাওয়া ত অনেক গেল! কিন্তু পালমশায়ের ভাংচির জোরে একটাও তো ডাঙ্গায় উঠলো না। সবই তো জলে রয়ে গেল।

হেমাঙ্গিনী বললে: হতভাগা মিনষে! নিজের ভাইঝির বিয়েতে ভাংচি দেয়! ও মিনষে বেঁচে থাকতে আমার মেয়ের বিয়ে হবে না! তুমি বাবা ও পাত্তরটা হাতছাড়া করো না। যত শীগ্‌গির পারো, লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।

(৪৬)

মঙ্গলবার সকালে হেমাঙ্গিনী কতকগুলো বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে মাজতে বসলো। আজ তার মনটা বড় খুসি! এতদিন পরে মেয়ের বিয়ে হবে,—কাজেই সে আমোদে আপনাকে ধরে রাখতে পারছিল না।

হঠাৎ পেছন দিকে একটা ছায়া পড়তে হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলো। ফিরে দেখে, ভাসুরের সেই মেয়ে মানুষটি! এর আগে আরো ছু'একবার সে এসেছে, হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ আত্মীয় ভাবেই কথা কয়েছে। কাজেই হেমাঙ্গিনী খুব যে ভয় পেলে, তা নয়!

গণু বললে: আজ এতো বাসন মাজার ধুম পড়েচে কেন? বাড়ীতে কাজ কম্ম কিছু আছে বুঝি?

যেখানেই বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। গণুর প্রশ্নে হেমাঙ্গিনীর মুখ খানা শুকিয়ে গেল। সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে: না, এমন কিছু নয়! কাজ কম্ম আর কি হবে?...তবে, ঐ সামান্য একটু পূজো-আচ্চা আছে কি না!

কি পূজো গা, এমন দিনে?

ঐ, আমার একটা মানত ছিল কি না! একটা ব্রত আছে।

বের্‌ত?...তা লোকজন কিছু খাবে বুঝি?

কে আর খাবে আমাদের বাড়ীতে বলো। আমরা তো একঘরে। তোমার ত জানতে কিছু বাকি নেই।

না, জানতে আর বাকি কি আছে? আমাদের বাড়ীর কত্তা ত তোমাকে একদণ্ড সোয়াস্তি দেবে না। মুখপোড়া মিনষে তোমার সব্বনাশ কর্ব্বার চেষ্টায় আছে।

আর সর্ব্বনাশের বাকি কি আছে? মেয়েটার বিয়ে কিছুতেই হতে দিচ্ছে না। যেখেনেই সম্বন্ধ হয় সেখেনে গিয়েই আমাদের নামে লাগান।

ওঁর ইচ্ছেটা কি জান? তুমি গিয়ে ওঁর বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করো। নোচ্চা পুরুষমানুষ তো? তোমার ওপর ওঁর চোখ পড়েচে।

হেমাঙ্গিনী আরও বিমর্ষ হয়ে বললে: এতদিনেও ওঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরলো না। আমি যে ওঁর ভাদ্র-বৌ হই এটা কি ওঁর মাথায় মোটে ঢুকবে না?

কই আর ঢুকচে? আমার সব্বনাশ ত করেছেন, তাতেও ওঁর মন উঠচে না। এখন ঘরোয়া কেলেঙ্কারি ক'রে তবে যদি ঠাণ্ডা হন।

আমার ইচ্ছে করে এসব জেনে শুনে, গলায় কলসী বেঁধে পুকুর জলে ডুবে মরতে! বিধবা মানুষ কোথায় নিষ্ঠা কাষ্ঠা নিয়ে দিন কাটাবো, না ওই সব কর্ম্মে যাবো! সেদিন যেন আমার মরণ হয়!

আমার সব্বনাশ কর্ব্বার আগে আমাকে কি কম যন্ত্রণা দিয়েছিলেন? যেতুম ঝিয়ের কাজে, উনি আসতেন ফষ্টি নষ্টি করতে! আমি যত

রাজি নই, ততো ভয় দেখাতে লাগলেন। বলেন তোর গলা টিপে মারবো, তোর বাবাকে অন্ধকার রাস্তায় লেঠেল দিয়ে মার খাওয়াবো, এই সব। ও সব পারে, সব পারে। তোমার ওপর যখন ওর চোখ পড়েচে, তোমাকে না কোন দিন পিছমোড়া ক'রে বেঁধে আপনার ডেরায় নিয়ে গিয়ে ফেলে!

হেমাঙ্গিনী গণুর কথা শুনে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। বললে: বলো কি? পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাবেন? অনাথা বিধবার ওপর এত অত্যেচার?

ওমা, তা বুঝি জান না? আমাকে কি করেছিলেন? আমি কি সহজে আমার ধম্ম দিই? একদিন পুকুর ঘাটে বাসন মাজছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই তিনটে যমদূতের মত লেঠেল এসে আমার মুখ বেঁধে ফেললে, তারপর পিছমোড়া করে বেঁধে বাড়ীর পেছন দিককার ঘরে নিয়ে গেল। তারপর ঘরের খিল বন্দ ক'রে দুষমন আমার গায়ে হাত দিলে। আমি কি ওর সঙ্গে জোরে পারি? নইলে আমার আজ এই দশা!

গণুর এই ইচ্ছাহীন অথচ বাধ্যতামূলক ব্যভিচারের লোমহর্ষণ ইতিহাসটা শোনবামাত্র হেমাঙ্গিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে ভয়ে আর কথা কইতে পারলে না। গণুকে যেভাবে জোর করে পাল মশাই আপনার কুৎসিত লম্পটবৃত্তিতে লাগিয়েছে, সেই ভাবে যদি তাকেও বাধ্য করে দেহ বিক্রয় করতে, তাহ'লে কি ক'রে সে রেহাই পাবে তার হাত থেকে? পরাণ মণ্ডল ত তাকে রক্ষা কর্ত্তে পারবে না। তবে? কি উপায়?

গণু বললে : কি ভাবচো দিদি ? ভেবে কিছু স্থির করতে পারবে না। তার চেয়ে তুমি এখান থেকে পালাও। নইলে তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে।

অন্ধকার পথে হেমাঙ্গিনী যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পে'ল। সেও মনে মনে ঠিক করলে, এ গাঁ থেকে সে যত শীঘ্র পারে পালাবে। কিন্তু কাজলের বিয়ে না দিয়ে সে কেমন ক'রে যায় ? বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে যাক, তারপর সে নিশ্চয়ই যাবে এ গ্রামটার সীমানা ছেড়ে।

প্রকাশ্যে বললে : তাই যাবো। তোমাদের গাঁ ছেড়ে, যেখানে দু'চক্ষু যায়, সেইখেনে চলে যাব। কাজলের বিয়েটা হয়ে যাক্ না।

গণু হাতখানা উল্‌টে বললে : তবেই হয়েছে ! কাজলের বিয়েও হয়েচে, তোমারও যাওয়া হয়েছে !

তখন হেমাঙ্গিনী চারদিক একবার চেয়ে, গণুর কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে : ভাই, কারুকে বলো না ; তুমি আমার জন্যে অনেক দরদ করো, তাই তোমাকে বলচি। কাজলের বিয়ে কাল হচ্চে। নারাণপুরের ন'কড়ি বিশ্বেসের ছেলের সঙ্গে কাল হবে। চুপি চুপি পাকা দেখা, গায়ে হলুদ সেরেছি। পাছে ভাসুর জানতে পেরে এখানেও ভাংচি দেয়, তাই গাঁয়ের কারুকে বলিনি। শুধু কালকের দিনটা চাপা রাখতে পারলেই, বোধ হয় আমার মেয়েটার একটা হিল্লে হয় ! দোহাই তোমার ভাই, তুমি যেন কারুকে বলো না। পালমশায়ের কাণে যেন কিছুতেই না ওঠে।

গণু নেহাত্ অন্তরঙ্গের মত বললে : না, না, আমি কেন বলতে

যাবো? তুমি কি আমায় তেমনি পেয়েছ? আমি তেমন গণু ডুম্‌নি নই যে, একজনের কথা আর একজনের কাছে গিয়ে লাগাবো। ধড়ে পেরাণ থাকতে ও কাজটা আমার দ্বারা হবে না। সে তুমি ঠিক জেনো।...আহা! তা হোক্, হোক্, মেয়ের ভাল জায়গাতেই বিয়ে হোক! আমরা শুনে সুখী! তুমি ভাল নোক, তোমার ভালই হোক্!

হেমাঙ্গিনী বললে: তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।...কিন্তু দেখো ভাই যেন কাক-কোকিলেও একথা টের না পায়!

তুমি পাগল হয়েছ? কেউ জানতে পারবে না! এই আমাকে যা বললে, তা বললে। আর গেরামের কেউ মরে গেলেও জানতে পারবে না।

তাহলেই হলো। তাহলে ভাই আমি আসি। আমার আজ ত অনেক কাজ। বরণডালা সাজাতে হবে, দান-সামিগগীর বেবস্থা করতে হবে, কাপড়-চোপড় তরি-তরকারি সবই ত যোগাড় করতে হবে?

গণু আত্মীয়ার চেয়ে অধিক আপনার হয়ে বললে: করতে হবে না? বলে, বিয়ে ত নয়, যেন অশ্বমেধ যজ্ঞি!...আচ্ছা আসি। কিন্তু তুমি বাপু, বিয়ের পরেই গা-ঢাকা দিও। একথাটা যেন মনে থাকে। বিয়ের আমোদে যেন নিজের প্যায়ে কুড়ুল মেরো না।

গণু পায়ে পায়ে চলে গেল। হেমাঙ্গিনীর মনে কিন্তু অনবরত মেঘ ও রৌদ্র আড়াআড়ি করতে লাগলো।

(৪৭)

নারাণপুরের ন'কড়ি বিশ্বেসের বাড়ীতে আজ বড় ধূম। আত্মীয়-কুটুম্বের অনেক এসে জমা হয়েছে। কেউ খাচ্চে, কেউ বেড়াচ্চে, কেউ সর্দ্দারি কচ্চে। ছেলের পাল রংচঙ্গে জামা কাপড় প'রে কখনও বাহিরে যাচ্চে, কখনও বাড়ীর ভেতর কলরব কচ্চে, কখনও বা পরস্পর মারামারি ক'রে বড়দের কাছে নালিশ কচ্চে। স্ত্রীলোকেরা কেউ গয়না পরচে, কেউ গয়না মাজচে, কেউ গয়না দেখিয়ে পরের কাছে নাম কিনচে। গিন্নীরা কেউ হুকুম কচ্চেন, কেউ ছেলেদের বকচেন, কেউ কেউ কর্ত্তার সঙ্গে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে দু'টো গোপন কথা কয়ে নিচ্চেন। বাড়ীতে ছেলের বিয়ে, কাজেই মস্ত কোলাহল।

বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তিরা ব'সে নানাবিধ গল্পগুজব কচ্ছিলেন। চাকর এসে মাঝে মাঝে থেলো ও রূপো-বাঁধানো হুঁকোয় তামাক দিয়ে যাচ্চিল। সানাইয়ের সুর প্রভাতী গেয়ে গ্রামের চারিদিকে সমারোহের বার্ত্তা জ্ঞাপন কচ্ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ দোগাছির পালমশাই এসে দেখা দিলেন সে বাড়ীতে।

—মশায়ের নাম ন'কড়ি বিশ্বেস?

—এজ্ঞে, অধীনের নাম।

—আজ আপনার বাড়ীতে ছেলের বিয়ে? বড়ই আনন্দের কথা।

—এজ্ঞে। মশায়ের কোথা হ'তে আসা হচ্চে?

—আমার নাম শ্রীরামচরণ পাল। বাড়ী দোগাছি।

—দোগাছি? ওঃ! সেখেনেই ত আজ আমার ছেলের বিয়ে।

আজ্ঞে। সে খবর পেয়েই আমিও আসচি আপনার কাছে।

নিবেদন কর্ত্তে আজ্ঞে হয়।

একটু গোপনে শুধু আপনার সঙ্গে একটা কথা কয়ে যেতে চাই।

আচ্ছা চলুন ঐ পাশের ঘরডায়।

পাশের ঘরে দু'জনে উপস্থিত হ'লে বিশ্বাসমশাই পালমশাইকে বসতে একটা মাদুর পেতে দিলেন। উভয়ে উপবেশন করলে পালমশাই আরম্ভ করলেনঃ শুনলুম, পরাণ মণ্ডলের বাড়ীতে আপনার ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে। বড়ই আনন্দের কথা! কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। যে মেয়েটিকে আপনি বউ ক'রে ঘরে আনচেন, তার মার বিষয়ে আমাদের একটু বলবার আছে।

বলুন। তিনি ত বিধবা মানুষ। মাথার ওপর কেউ নেই। এক-পরাণ মণ্ডল মশাই তাঁকে খেতে পরতে দেন। আমরা জেনে শুনেই বিয়ে দিচ্চি, কেননা, মেয়েটি বড় সুন্দরী। আমাদের বড় চোখে লেগেছে। আমরা এক পয়সাও তাঁদের কাছে নিচ্চি নে। এমন কি গয়না টয়না অবধি ঘর থেকে দিয়ে আমরা বিয়ে ক'রে আনচি। তা বোধ হয় শুনেচেন?

হাঁ, তা শুনেচি। আপনারা মহাশয় লোক, উঁচু বংশ, হবে না কেন বলুন। উঁচু বংশ বলেই যাতে আপনাদের বংশে কোনও কলঙ্ক না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আসা। আমরা থাকতে, নিষ্কলঙ্ক বংশে একটা দোষারোপ হবে, সেটা কি চোখে দেখা যায়?

ন'কড়ি বিশ্বাস পালমশাইয়ের কথায় বড়ই সন্দিহান হলেন। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন: সে কি কথা? আমরা যতদূর সম্ভব খবর নিয়েই তো এ কাজে লেগেছি। আর পরাণ মণ্ডল মশাইকে আমরা খুব ভাল লোক ব'লেই জানি। আমাদের একবার একটা খুব বিপদের সময়ে তিনি ভারি উপকার করেছিলেন। একটা জমি জমার মকদ্দমায় সত্যকথা ব'লে তিনি আমাদের জান বাঁচান। তাতে তাঁর নিজের বেদম ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আদালতে সত্যিকথা বলতে পেছ-পাও হন নি। তাঁর ওপরে সেই অবধি আমাদের অগাধ বিশ্বেস। কাজেই তিনি একটু আপনার করে বলতে আমরা এ কাজে লেগেছি। তিনি দিব্বি গেলে বলেছেন, তিনি জানেন এ মেয়েটি উঁচু গেরস্তর মেয়ে, বিপদে পড়ে এখন তাঁর গলায় পড়েছে! নইলে এর বাপের অবস্থা একদিন নাকি ভালই ছিল। তবে আপনি আবার এ নতুন কথা কি তুলচেন?

পালমশাই ভালমানুষ সেজে বললেন: না, আপনাদের যদি এত বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে আমি কিছুই বলবো না। তবে কি জানেন, আমরা পাড়ার লোক। পাশেই তো থাকি, কাজেই সব খবর রাখি। আপনার উপকারের জন্যই এসেছিলুম। না, থাক্!......আপনাদের যখন এত বিশ্বাস, তখন আর কথাটা পেড়ে কাজ নেই!

তবু, সন্দিগ্ধ হয়ে বিশ্বেসমশাই বললেন: না, না, বলুন না! কি ব্যাপারটা শুনি। আমরা যখন বিয়ে দেবো, তখন সব কথা শুনবো বৈ কি! আর বিশেষ, আপনি কষ্ট ক'রে, এতটা রাস্তা হেঁটে......

হাঁ, পরের উপকার ভদ্রলোক মাত্রেই করতে হয় বৈ কি! অনেক

সময়, নিজের কাজের ক্ষতি করেও, সদ্বংশের যাতে কোনও কলঙ্ক না ঘটে, করতে হয় বৈ কি! তাই এলুম। কথাটা বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ মেয়েটির মায়ের সম্বন্ধে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে.....সেটা আমাদের চক্ষে বড় খারাপ খারাপ ঠেকে! বিশেষ আপনাদের বড় বংশ!

বিশ্বাসমশায় দাঁড়িয়েছিলেন, পালমশাইয়ের কথা শুনে একেবারে মাটিতে বসে পড়লেন! কপালে হাত দিয়ে বললেন: গুজবটা কি ঠিক?

পালমশাই আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন: হাঁ, ঠিকও বটে...... আবার ঠিক নাও হয়তো হ'তে পারে! তবে পাড়ার কেউ কেউ নাকি স্বচক্ষে একটু বাড়াবাড়ী রকমের দেখেছে......তাই একবার বলতে এলুম। দেখেন নি, আপনাদের পাকা দেখার দিন পাড়ার কেউ পরাণ মণ্ডলের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না!

কপাল থেকে হাত নামিয়ে বিশ্বাসমশাই বললেন: সেটা ওঁরা বললেন, ওঁরা গরীব ব'লে কারুকেও বলতে পারেন নি। তবে দু' এক জন ত উপস্থিত ছিলেন, আমাদের সঙ্গে বসে খেয়েও গেলেন?

পালমশাই প্রতিবাদ ক'রে বললেন: ভদ্রলোক কেউ নয়; তবে চাষাভূষো দু'একজন হয়তো খেয়ে থাকতে পারে। পরাণ মণ্ডলকে আমাদের সমাজে যে একঘরে করেছে।

বিশ্বাসমশাই চম্‌কে উঠে বললেন: একঘরে করেছে?

পালমশাই মনে মনে আনন্দ অনুভব ক'রে বললেন: তবে আর বলছি কি? আরও এক ঘটনা আছে, সেজন্যেও ওঁরা একঘরে। যে মেয়েটি আপনার পুত্রবধূ হতে চলেছে, ওর বড় বোন......যাক্‌গে সে

কথা! কত আর শোনাব? সে কথাটা আর আপনার শুনে কাজ নেই!

গলায় চোপ দিয়ে আধ-কাটা ক'রে রাখলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার যন্ত্রণা অনুভব করে বিশ্বেসমশাই বললেন: বলুন বলুন মশাই! সবটাই শুনি! ওঃ ভগবান্!

কি আর বলবো? সবই কেলেঙ্কারির কথা! আপনি আজ তাদের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্চেন, কাজেই আপনাকে এ সব কথা শোনান উচিত হচ্চে না! এটা বেশ বুঝি! কিন্তু কি কর্ব্বো বলুন। আমাদের কর্ত্তব্যবোধ ব'লে ত একটা জিনিস আছে। পরাণ মণ্ডলের না হয় সে জিনিষটা নেই। কিন্তু আমরা উঁচু ঘরের সন্তান, আমরা কি করে সে কথা চেপে যাই? এর পরে যখন এসব কথা বেরিয়ে পড়বে, তখন আপনিই বা কি বলবেন? বলুন না মশাই? কথাটা চেপে রাখা কি আমাদের পক্ষে উচিত?

জীবনে এ রকম সমস্যার মধ্যে বিশ্বাসমশায় আর কখনও পড়েন নি। কি ভয়ানক একটা কথা আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলে বসেন, এই ভয়ে তাঁর বুকের ভেতর একেবারে শুখিয়ে উঠতে লাগলো।

পালমশাই সময় বুঝে কোপ দিলেন। একটু থেমে পরে বললেন: তবে চুপি চুপি কথাটা বলি শুনুন। আমি কি সাধে আপনার এখানে দৌড়ে এসেছি?

পরে চারিদিক চেয়ে, বিশ্বাস মশায়ের কাণের কাছে মুখ এনে রামচরণ পাল তাঁর ভাইঝি নয়নতারার ব্যভিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অনেক অতিরঞ্জনও তার ভেতর ঘটে গেল! পরিশেষে

বললেন ঃ এ মেয়েটিও ভেতরে ভেতরে যে ডুবে জল খাচ্চেন না, তারই বা প্রমাণ কি ? ভেতরে কিছু না থাকলে পরাণ মণ্ডল ওকে বাড়ীতে রাখবে কেন ? ওর যে একটা আইবুড়ো ষণ্ডা-গুণ্ডা ছেলে আছে, সেইটির সঙ্গে নাকি মেয়েটাকে অনেকবার দেখা গেছে।

বিশ্বাস মশায়ের মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল। তিনি একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন ঃ উঃ! পরাণ মণ্ডল শেষকালে এই জোচ্চুরিটা আমার সঙ্গে করলেন! নাঃ! পৃথিবীতে আর কারুকে বিশ্বাস নেই দেখচি! ঘোর কলিকাল এসে পড়েছে!

পালমশাই মনের আনন্দে সুর মিশিয়ে বললেন ঃ ঘোর কলি! ঘোর কলি! তা না হলে, খোট্টা মেড়ো—যার ছায়া মাড়ালে আমাদের তিনবার গঙ্গাচ্চান করতে হয়, গায়ের গন্ধ শুঁকলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে যায়,—তার সঙ্গে কিনা বিয়ে! গেরস্থ ঘরের মেয়ে (বলতে বলতে পালমশাই খুব মাথা ঘোরাতে লাগলেন)...আর এই চলাঢলিটা! গেরামের লোক বেশ করেছে! ও দু'জনকেই একঘরে করেছে! পরাণ মণ্ডলকে আর ওই ধেড়ে মাগীকে!

এই সকল শুভ নিঃস্বার্থ পরোপকার সেরে পালমশাই যখন বিশ্বাসবাড়ী থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর মন যে শুধু আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল তা নয়; তাঁর বিপুল ভুঁড়িটিও সকৃতজ্ঞ মিষ্টান্ন-ভারে অভিনন্দন-নৃত্য করতে লাগলো।

(৪৮)

বিয়ে বাড়ী, কিন্তু না আছে নহবতের শব্দ, না আছে কোনও হৈ-চৈ। পাশের বাড়ীর লোক এখনও জানতে পারেনি যে, এ বাড়ীতে আজ রাত্রে প্রজাপতি ঠাকুরের ঘটা চলবে। ঝুড়ি ঝুড়ি কলাপাতার আমদানি, বড় বড় কড়া-গামলা-বারখোস মাজার ঝন্ ঝন্ টক্ টক্ শব্দ, কুমোর বাড়ী থেকে বাহকের মাথায় খুরি-ভাঁড়-মালসার আবির্ভাব, ময়রার দোকান থেকে প্রাণ-মাতোয়ারা সন্দেশ-মিষ্টান্নের স-বিজ্ঞাপন শোভাযাত্রা, এ সব কিছুই হচ্চে না। পাড়ার জীবন-ধারা যেমন রোজ চলে, তেমনই চলচে।

শুধু পরাণ মণ্ডল সেদিন মাঠে যাওয়া বন্ধ করে বারকতক মুদীর দোকানে যাতায়াত করলো। তাতেই একটু গোলযোগের সম্ভব হয়ে উঠলো।

পালমশাই রোজ একবার সনাতনের দোকানে বিনি-পয়সায় তেল মাখতে যায়। সেখেনে বসে বসে, তেল মাখতে মাখতে দেখলে, পরাণ যা জিনিষ কিনচে তাতে একটু বিশেষ নতুনত্ব আছে। পাল মশাই আর চুপ করে থাকতে পারলে না, পরাণকে একটা বিদ্রূপের চিম্‌টি কেটে জিজ্ঞাসা করলো: কি পরাণ, একেবারে এক বছরের জিনিষ কিন্‌চো নাকি ?

প্রশ্ন শুনে পরাণ একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু উত্তর তো

একটা দিতে হবে। সে একটু ভেবে নিয়ে বললে ঃ না, এক বছরের কেন কিনবো ? একদিনের কিনচি।

এত জিনিষ একদিনে খরচ কর্ব্বে ? বাড়ীতে নতুন কুটুম্ব আসবে বুঝি ?

কুটুম্ব কি আর তোমাদের জ্বালায় আসবার জো আছে ?...ঐ একটা কাজ আছে ! বাবার আজ সাম্বৎসরিক কিনা ?

বটে ! তা ভাল, ভাল। আজকাল দেখচি ধম্মকম্মে বেশ মন দিয়েচ ! এটা দেখচি, বাড়ীতে ঐ মেয়েমানুষটি রাখবার পর থেকেই হয়েছে ! বলি, ছেলের অন্নপ্রাশন নয়তো ?

পরাণ ঠাট্টাটা শুনে মনে বেশ একটু চটে গেল। বুড়ো মানুষ সেটা বরদাস্ত করতে পারলে না। উত্তর করলে ঃ অন্নপ্রাশন ত তোমার বাড়ীতেই হবার কথা। ছিরু ডোমকে যে দেখলুম, দহুত্তুরের জন্যে চেলি কাপড় কিনেচে !

পালমশাই তেল মাথা বন্ধ ক'রে হঠাৎ কট মটিয়ে পরাণের দিকে চাইলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললে ঃ চেলি কাপড় কেনাবো 'খুন আজ সন্ধ্যে বেলায় ! তুই বড় বাড়িয়েছিস ! এততেও তোর আক্কেল হয় নি ! আচ্ছা আজ কোন্ ডোমের চেলিকাপড় কার কোমরে গিয়ে ওঠে দেখবি'খন।

হাঁ, তবু যদি নিজের ভাদ্দর-বৌকে ছুটী এঁটো-কাঁটা দিয়ে পুষতে পারতে ! তাহ'লেও তোমার দপ্-দপানি সহ্য কর্ত্তাম।

পালমশাই এক ধমক দিয়ে বললো ঃ চুপ কর্ বেটা বুড়ো চাষা ! ফের যদি ভদ্দরলোকের ওপর কথা ক'বি, তাহ'লে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

বুড়ো পরাণ জিনিষপত্রগুলো কাঁধের ওপর তুলে বললে : ভদ্দর নোক কি আর গায়ে নেখা থাকে? কাজে দেখাতে হয়। হাড় ভাঙ্গে সব শালা! এতদিন তো হাড় ভেঙ্গেচ, তবু এখনও যে ভাঙ্গা হাড়ে ভেলকি খেলচে?

পালমশাই মুখ নেড়ে বললে: ভেলকি আর খেলবে না যাদু! আজ টের পাবে, দোগাছির পালমশায়ের পের্‌তাপ কত্তো। নারাণপুরের ন' কড়ি বিশ্বেস আজ কেমন তোর বাড়ী পাত পাড়ে, দেখে নে'ব!

বোঁ ক'রে পরাণের মাথা ঘুরে গেল। নারাণপুরের ন'কড়ি বিশ্বেসের ঠিকানা এ বেটা পেলে কোথা থেকে? তবে কি জানতে পেরেচে? কোথা থেকে জানলে?

সর্ব্বনাশ! তবে ত দেখচি, ভারি গণ্ডগোল বাঁধবে!

পরাণ আর একমুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াল না। হন্ হন্ ক'রে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

পালমশাই পেছন থেকে ডাকলো, "কিরে পরাণে, চললি যে? কথার উত্তর দিলিনে যে?"

সনাতনমুদী জিজ্ঞাসা করলো : কি ব্যাপার, পালমশাই?

পালমশাই বললে: আজ সন্ধ্যে বেলাই তোমরা সব টের পাবে, বেটার বাপের ছ্যাদ্দ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আজ ও বেটারই ছ্যাদ্দ হবে জীবন্তে!

(৪৯)

পরাণ পালমশাইয়ের ইসারা বুঝে বড় ভয় পেলে। হেমাঙ্গিনীকে সে কথা বলতে তার সাহস হ'ল না। সে বিমর্ষ ভাবে চুপ ক'রে বসে রইলো।

বর আসবে বেলা পাঁচটায়। ততক্ষণ পরাণ কেবল ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলো। কারুকে কিছু না ব'লে সে শুধু সেই অনিশ্চিত মহা-শক্তির ওপর নির্ভর করে রইলো।

যা ভয় করেছিল, ঠিক তাই ঘটলো। বেলা পাঁচটা বেজে গেল, বর এলো না। পরাণ একেবারে হা-হুতাশ করে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

হেমাঙ্গিনী শুনেছিল, বেলা পাঁচটায় বর আসবে। সে তার আগেই মেয়েকে ধুয়ে মুছে, চুল বেঁধে দিয়ে, কনে-সাজন সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। পরাণ একখানা সস্তার চেলি কিনে দিয়েছিল, সেখানা-শুদ্ধ পরানো তার শেষ হয়ে গেছে। জীবনে এতো আনন্দ বোধ হয় সে কোনদিনই উপভোগ করে নি, যতো করছিল সেই দিন মেয়ে সাজাবার সময়। কিন্তু যখন রোদ্দুর গাছের মাথায় উঠে শেষ বিদায়ের আগে ঝিক্ ঝিক্ করতে লাগলো, তখন হেমাঙ্গিনীর আনন্দ-স্রোত হঠাৎ বাধা পেলো একটা প্রত্যাশিত বিষয়ের অঘটনে! বর আসবে পাঁচটায়! এখনো এলো না কেন?

পাখীরা দল বেঁধে চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরতে লাগলো। হেমাঙ্গিনীর উৎসাহ তাতেও খানিকটা দমে গেল।

কিন্তু যে সময় দিনের শেষ আভাটুকু নিতান্ত নিষ্ঠুর নিয়মে পৃথিবী থেকে অবসর গ্রহণ করলো, তখন আর হেমাঙ্গিনী চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। পরাণ মণ্ডলের কাছে গিয়ে বললেঃ বাবা, কই বর এলো না?

পরাণ তার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠলো। বললে: তাইত মা, ব্যাপারটা ত বড় ভাল ঠেকচে না!

হেমাঙ্গিনী ধপ্‌ করে মাটিতে বসে পড়ে বললে: একবার একটু আগু বেড়ে দেখলে হয় না?

"তাই দেখি!" বলে পরাণ নেহাত্‌ অপদস্থের মত ঠেলে উঠলো। একখান আধ ময়লা উড়্‌নি কাঁধে ফেলে বাড়ী থেকে বার হ'লো।

ঘণ্টা দুই যায়! রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীকে কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত করে দিল। এত সময়ের মধ্যে হেমাঙ্গিনী একটা পালকিরও বাড়ীর সুমুখে আসার শব্দ শুনতে পে'ল না।

আরও কিছু সময় পরে পরাণ ফিরে এলো। এসে বললে: মা? সর্ব্বনাশ হ'লো। নকড়ি বিশ্বেস আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

হেমাঙ্গিনী কথা শুনে কোনও উত্তর করলো না। স্তম্ভিতভাবে বসে রইলো।

পরাণ বলতে লাগলো: পায়ে পায়ে এগুতে এগুতে নারাণপুর অবধি গেলাম। সেখানে গিয়ে ন'কড়ি বিশ্বেসের বাড়ীতে ঢুকলুম। সে আমাকে দেখে যে গালাগালি পাড়লে, তাতে কাণে আঙুল দিতে হয়! না মা, কাজলের বুঝি বিয়ে হ'ল না!

হেমাঙ্গিনী বসে ছিল, শুয়ে পড়লো। একটি কথাও সে কইলে না, এত বড় দুঃসম্বাদের পর!

হেমাঙ্গিনী কোনও কথা কইলো না দেখে, পরাণ সেখান থেকে সরে গেল। তার মনটাও অপমানে লজ্জায় বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিল।

আরও কতক্ষণ পরে, বাহিরে কে একজন ডেকে বললে: পরাণ, বাড়ী আছ?

পরাণ ছিল তার ছোট্ট ঘরটিতে বসে। সে কণ্ঠস্বর শুনে বেশ বুঝতে পারলে, এ কার গলা। সে কোন উত্তর দিল না।

বাহিরে দাঁড়িয়ে লোকটা অতি কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে বললে: বলি, ন'কড়ি বিশ্বেসের ছেলে বিয়ে কর্ত্তে এসেছে রে পরাণে?

ঘরের কোণে একটা মোটা বাঁশের লাঠি ছিল। পরাণ তড়াক্ ক'রে উঠে সেই লাঠিটা নিয়ে বাঘের মত চেঁচিয়ে বললে: তবে রে শালা, আবার এখেনে এসেছ ঠাট্টা-তামাসা করতে? এই বাঁশের লাঠিটা দিয়ে তোর মাথা দু'ফাঁক করে দেবো!" বলতে বলতেই একেবারে ঘরের বাইরে!

কিন্তু লাঠির সদ্ব্যবহার হ'ল না। যে বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা কচ্ছিল, সে পরাণের হাতে লাঠি দেখেই একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়।

(৫০)

হেমাঙ্গিনী এক সময় উঠে, টল্‌তে টল্‌তে আপনার ঘরটিতে গিয়ে দরজার খিল বন্ধ ক'রে দিল। পরাণ আর তার সঙ্গে দেখা করলে না আপনার অকৃতকার্য্যতার অপমান-বোধে।

বর আসবে না, কাজেই বিয়ে হবে না, শুনে বাড়ীর অপরাপর লোক সকলেই হায় হায় করতে লাগলো। পরাণের বৃদ্ধা পত্নী একেবারে কপাল চাপড়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

কাজল হতভম্ব হয়ে শেষে শোবার জন্যে মায়ের ঘরের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে, মায়ের ঘরের দরজা বন্দ। মা'কে অনেক ডাকলো, ঘরের দরজায় অনেক করাঘাত করলো, কিন্তু তার মা কোন সাড়াও দিল না, দরজাও খুললো না। কাজেই সে সেখান থেকে ফিরে পরাণের স্ত্রীর কাছে এসে শুলো।

সকাল হ'ল, যেমন সব জায়গায়ই হয়। সকলেই উঠলো, উঠে আপন আপন কাজে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ সকলে আবিষ্কার করলো, হেমাঙ্গিনীর ঘরের দরজা খোলা, অথচ হেমাঙ্গিনী বাড়ীতে নাই।

পরাণের কাছে সম্বাদ যেতে সে বললে: দেখো দেখি, পুকুর ঘাটে যায় নি তো?

সকলেই বললে: সেখানে ত নেই; আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না!

পরাণ আর্ত্তস্বরে বলে উঠলো: অ্যাঁ, বলো কি? তবে কি মা আমার অভিমানে বাড়ী ছেড়ে গেল!

কাজল কাঁদতে লাগলো মায়ের জন্যে। তাকে সান্ত্বনা অনেকেই দিল; কিন্তু সে সান্ত্বনা তার জীবনে কখনও ফলবতী হ'ল না।

(৫১)

বছর যেতে না যেতে প্রজাপতি ঠাকুরের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে এসে, মা ষষ্ঠী নয়নতারা ও লছমনের বাড়ীতে পূজা খেতে বসে গিয়েছিলেন।

ষষ্ঠীদেবী যখন নবদম্পতীর শয্যাগৃহে প্রবেশ ক'রে একুশ দিনের দিন একটি ছোট বটগাছের ডাল মাথায় দিয়ে কলা-মূলো-ছোলা খান, তখন বটগাছের বীচির মতই অসংখ্য ও অপর্য্যাপ্ত আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেন, যজমানের মাথায়। লছমন ও নয়নতারার মাথায়ও তিনি তেমনি আশীর্ব্বাদ ঢালতে লাগলেন বছরে একটি ক'রে অবাধ ভাবে। আট বছরে, তিনটি ছেলে ও গুটি দু'তিন মেয়ে, হাসি ও কলরবের রথযাত্রা চালিয়ে দিয়ে বাপ-মাকে ক'রে তুললো শুধু শশব্যস্ত নয়, বেশ কুণ্ঠিত ও ব্যাকুল।

নয়নকে অনেক দিনই চটকলে চাকরির কথা মন থেকে তুলে দিতে হয়েছে। ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করতেই সে সমস্ত দিনরাতের মধ্যে অবসর পায় না, পাটের কলে চাকরি করতে যাবে কোন্ সময়?

নয়নতারার খাতিরে লছমনের মাহিনে অবশ্য কিছু বেড়েছে, কিন্তু যে অনুপাতে অপর্য্যাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজন বাড়লো, সে অনুপাতে কিছুই নয়। কাজেই লছমনকে ওপর-টাইম প্রায়ই খাটতে হোত।

ছেলেমেয়েদের পরিচর্য্যা নয়নতারার মন থেকে মায়ের স্মৃতি একেবারেই আড়াল করে রেখেছিল। এমন যে একদিন ছিল, যে দিন নয়নতারার মা ছাড়া আর কেহই আপনার ব'লে ছিল না, সে দিনের কথা তার মনে একবারও ঠেলে ওঠে না। মানুষের পূর্ব্ব স্মৃতি বর্ত্তমানের স্তূপীভূত জঞ্জালে চাপা পড়ে যায়।

* * *

ছেলেমেয়েগুলি বাড়ীর বাহিরে বস্তির রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খেলা কচ্ছিল। রৌদ্রের ঝাঁজটা এখন একটু কমে এসেছে, কিন্তু একেবারে যায় নি। নয়ন খাওয়া-দাওয়া সেরে একখানা কাঁথা নিয়ে বসেছিল, সে খানাকে চলন-সই কর্ব্বার জন্যে। সূচ-সুতার ব্যাপারে মা'কে ব্যস্ত থাকতে দেখে, তার সুবুদ্ধি ছেলে মেয়েগুলি বাড়ীর বাহিরে গিয়ে স্বাধীন-তন্ত্রের আস্বাদন নিচ্ছিল।

বেলা তিনটে হবে। ভিস্তিরা রাস্তায় জল দিতে সুরু করেছে তাদের চামড়ার ব্যাগ্ নিয়ে। পথ অপেক্ষাকৃত অনেকটাই নির্জ্জন, যদিও এক-আধ জন ফেরিওয়ালা রৌদ্র কি গরম কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে তাদের পেটের দাসত্ব করতে ঘুরে বেড়াচ্চে।

বস্তির বাসিন্দারা অধিকাংশই কলে গিয়েছিল দিন-মজুরী করতে।

স্ত্রীলোকেরা অনেকেই অবশ্য লাইনে ছিল, কিন্তু দুপুর বেলায় সকলেই নির্ঝঞ্ঝাটে বিশ্রাম উপভোগ কচ্ছিল।

নয়নতারা সূচে সুতো পরাতে পরাতে হঠাৎ শুনতে পেলে, তার ছেলেমেয়েরা বাহিরের রাস্তায় ভয় পেয়ে চিৎকার কচ্চে। সূচটি মাটিতে রেখে সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : কি হয়েছে রে ক্ষেতু ?

—'দেখোনা মা, একটা পাগলী আমাদের মারতে আসচে।' ছেলেটি বাহির থেকে জানালো।

—মারতে আসচে ? কেনরে পাগলি ? ছেলেপুলেদের মারচিস্ ?

বলতে বলতে নয়নতারা একেবারে বাহিরে এসে দাঁড়াল। এসে দেখে, সত্যি-সত্যিই এক পাগলী তেড়ে আসছে তার ছেলেমেয়েদের মারতে। পাগলীটার চেহারা দেখলে ভয় হয়! তার মাথার চুলগুলো এলোথেলো ; শোণের দড়ির মত জটা-পাকানো! পরণের কাপড়খানা যেমনি ময়লা, তেমনি হাজার জায়গায় ছেঁড়া! তা দিয়ে লজ্জানিবারণের কাজ অর্দ্ধেকও হচ্চে না! চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল! মুখ থেকে সে দুটো ছিট্‌কে বেরিয়ে যেন আগুণের গোলার মত ছুটে আসচে। কাঁধে আছে একটা ঝুলি, সেটার মধ্যে কতকগুলো কি জিনিষ খড়্ খড় কচ্ছিল।

তাকে দেখে নয়নতারাও ভয় পেলে। সে তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়েদের ধরে বাড়ীর মধ্যে টেনে আনতে লাগলো। পাগলী তা দেখে বললে : ওদের টেনে নিয়ে যাচ্চিস্ কেন ? তুই বুঝি ওদের মা হ'স্ ?

—আ মর পাগলি! ছেলেমেয়েদের মারতে আসচিস্ কেন ?

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠলো। পরে বললে : কেউ বাদ

যাবে না! কেউ বাদ যাবে না! এর পরে দেখবি, ঐ ছেলেমেয়েরা তোরই মুখ পুড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

নয়নতারা পাগলীর কাছ থেকে এই অযাচিত অভিশাপ খেয়ে বললে : আ, গেল যা। শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছিস্ কেন রে মাগি?

—দেবো না? তুই আমার মুখ পুড়িয়েছিস্, আর তোর মুখ তোর ছেলেমেয়েরা পোড়াবে না?

কথাটা শুনে নয়নতারার একটা স্মৃতি চাবুক খেয়ে লাফিয়ে উঠলো। প্রায় আঠ বছর আগেকার কথা হঠাৎ তার মাথার মধ্যে আগুন জেলে দিল। ঠিক সেই মুখ, সেই স্নেহের বকুনি! এ ভুল হবার নয়! মা'র এই অবস্থা! নয়নতারা কিছুক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলে না।

—কি রে মেড়োর বউ? কথা কচ্চিস্‌নে যে? পাগলী তাকে জিজ্ঞাসা করলো!

নয়ন লজ্জিত সংযমে আপনাকে সামলে নিয়ে বললে : মা? তুমি? তুমি এতদিন বাদে,...

পাগলী মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কেটে বললে : মা? কে তোর মা? আমি? আমি খোট্টানির মা হইনে। আমার মেয়ে বাঙালী ছিল! তার বাপ বাঙালী, তার মা বাঙালী, সেও বাঙালী ছিল!

এ সব কথা শুনে নয়ন বুঝলো, খোট্টাকে বিয়ে করার জন্যে এখনও তার মা'র তার ওপর অভিমান আছে। কিন্তু সে তার জন্যে কি করবে? যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফেরবার নয়!

কাজেই নয়ন মা'র কথা কাণে না তুলে, অতি ধীরভাবে

জিজ্ঞাসা করলো : তুমি এতদিন কোথায় ছিলে মা? ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ বুঝি?

—ঘুরে বেড়াব কেন? আমি ছিলুম আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে। সেখেনে সব লোক বাঙালী। কেউ হিন্দুস্থানী হয়নি। বুঝলি? তারা তোর মত খোট্টার হাঁড়িতে ভাত খায় না।

এ শ্লেষগুলোও কাণে না তুলে, নয়নতারা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে : যা হ'বার তা হয়ে গিয়েছে, এখন আর সে নিয়ে গালাগালি দিয়ে কি কর্ব্বে? নিজেই শুধু কষ্ট পাবে বৈত নয়? এসো, বাড়ীর মধ্যে এসো! তোমায় ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে তুলি। মা,—ও মা?

পাগলী অন্যমনস্ক হয়ে আবার বিড় বিড় করে বক্‌তে লাগলো। তা দেখে নয়নতারা আবার তাকে 'মা মা' বলে ডাক দিল।

নয়নের বড় ছেলের সেটা সইলো না। সে জিজ্ঞাসা করলো : ঐ পাগলীটাকে 'মা' বলে ডাকচিস্ কেন মা?

পাগলী ক্ষেপে উঠলো। চোখ মুখ পাকিয়ে নয়নের ছেলের দিকে তাকিয়ে বললে : পাগলী? ওরে আমার খোট্টার বেটা রে! আমায় পাগলী বলতে এসেচেন!

নয়ন ছেলেকে ধমক দিয়ে বললে : ছি! পাগলী বলতে নেই! ও যে তোদের দিদিমা হয়!

পাগলীর দিকে ফিরে নয়ন বললে : মা? ওর ওপর রাগ কোরো না! হাজার হোক্, তোমার নাতি ত বটে!

—নাতি? হি হি হি হি! বলিস্ কিরে নয়না, নাতি? তাহ'লে

সত্যি তুই সেই খোট্টাটাকে বিয়ে করেছিস্! আ মরণ তোমার! আমার মুখটা পোড়ালি! মুখে আগুণ! মুখে আগুণ!

নয়ন মা'কে আবার সেই কথা তুলতে দেখে, কথা ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা মা, তুমি ত দেখচি একা ছেঁড়া কাপড়ে ঝুলি কাঁধে ক'রে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্চ! কাজল কোথায় গেল?

কাজলের কথায় হেমাঙ্গিনী ফোঁস করে উঠলো। বললে: কাজলের কথা খবরদার তুই জিজ্ঞেস করিস্ নে! তোর মাথার দিব্বি! তুই তোর মা'র পোড়ামুখ দেখবি।

নয়ন কাজলের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে এই ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো: কেন, কাজলের কি হয়েছে, বলো না মা! আমার যে তার জন্যে বড্ড মন কেমন করে!

—মন কেমন করে? সয়তানি! তুইই তো তার সর্ব্বনাশ করলি! তোর জন্যেই তো তার বিয়ে হ'ল না! তুই যদি খোট্টা বিয়ে না করতিস্, তার বিয়ে আজ আটকায় কে? ভাসুরের সাধ্যি কি, তার বিয়ের দিনে বরকে ভাংচি দেয়! তোর জন্যেই তো এত হ'ল! তুই—তুই! তোর হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! তোর জন্যেই কাজলও পরের বাড়ীতে আইবুড়ো হ'য়ে পড়ে রইলো! তুই সর্ব্বনাশী আমার কাজলকেও খেলি, আমাকেও খেলি!

হেমাঙ্গিনী রাগে, মুখ ভেংচে, গালাগালি দিতে দিতে ফিরলো। সেখান থেকে ছট্‌কে চলে যাবার জন্যে সে যেমনি পেছন ফিরেছে, অমনি আঁতকে উঠলো একজন জোয়ান বাঙ্গালীর মত দেখতে খোট্টাকে দেখে! সে এতক্ষণ কথা কয়নি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পাগলীর কথাবার্ত্তা

শুনছিল। এখন হেমাঙ্গিনীকে চিনতে পেরে বললে: কোথায় চললে? আমরা তোমায় যেতে দেবো না।

হেমাঙ্গিনী প্রথমটা থতমত খেয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই লছমনকে চিনে ফেলে, একেবারে ক্ষেপে উঠলো। বললে: তবে রে বেটা খোট্টার ছেলে! যেতে দিবিনে? তোর বাড়ীতে তোর ভাত খেয়ে থাকবো? আয় দেখি, কেমন ক'রে আটকাস্?

বলেই রাস্তা থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে পাগলী হঠাৎ ছুঁড়ে মারলো লছমনকে! লছমন ছিল অসাবধান, পালাবার অবকাশ পে'ল না। ঢেলাটা সজোরে লাগতেই তার কপাল খানিকটা কেটে গেল, এবং সেখান থেকে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত বেরুতে লাগলো।

নয়নতারা দৌড়ে এসে আঁচল দিয়ে সেখানটা টিপে ধরলে। লছমনের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, সে তৎক্ষণাৎ সেখানেই বসে পড়লো।

পাগলী দাঁতে দাঁত দিয়ে, মুখ বীভৎস ক'রে বললে: কেমন হয়েছে? আর আমার মেয়েকে বিয়ে করবি? খোট্টা হয়ে বাঙ্গালা মেয়ের সঙ্গে ন্যাকামি? বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে!

বলতে বলতেই হেমাঙ্গিনী সেখান থেকে দৌড়ে পালা'ল।

সমাপ্ত